

ইকবাল কবীর মোহন



বোসনিয়ার
আর্তনাদ



বোসনিয়ার আত্মনাদ

ইকবাল কবীর মোহন

বোসনিয়ার আত্ননাদ

প্রকাশিকাঃ নার্মিস মুনিরা, ৫৭/১, উত্তর গোড়ান, ঢাকা।

স্বত্ব

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশঃ ২৮শে আগস্ট, '৯৩

দ্বিতীয় প্রকাশঃ ২৫শে ডিসেম্বর '৯৪

কভার ডিজাইন

আরিফুর রহমান

মুদ্রকঃ

হক প্রিন্টার্স, ১৪৩/১, আরামবাগ, ঢাকা

মূল্য : ৪০.০০

Bosnear Artanad Written by Iqbal Kabir Mohon Published by

Nargis Monira Price : Tk. 40.00

সূচী পত্র

রক্তস্নাত বোসনিয়া / ৫
বোসনিয়ার ইতিহাস / ১২
বোসনিয়া পরিচিতি / ১৬
ইতিহাসের যুগোশ্লাভিয়া / ১৭
যুগোশ্লাভিয়ার গৃহযুদ্ধ / ১৯
বোসনিয়ায় সার্বিয়ার গণহত্যা / ২২
বোসনিয়ায় সার্বিয় আখ্যাসনের কারণ / ২৫
বোসনিয়ায় মুসলিম হত্যায় বৃটেনের ভূমিকা / ২৮
বোসনিয়ার হত্যাযজ্ঞে ফ্রান্সের ভূমিকা / ৩৫
সার্বিয় গণহত্যায় রাশিয়ার সমর্থন / ৩৭
বোসনিয়ার ক্ষেত্রে আমেরিকার হতাশাজনক নীতি / ৩৯
জাতিসংঘ ও বোসনিয়া / ৪২
বোসনিয়ায় আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ এবং এর বাস্তবতা / ৪৬
মুসলিম বিশ্ব এবং ওআইসি'র দেউলিয়াপনা / ৪৯
ভ্যান্স-ওয়েন পরিকল্পনা ও ইসি'র ষড়যন্ত্র : বিভক্তির পথে বোসনিয়া / ৫৩
বোসনিয়ায় সার্বিয়ার বর্বরোচিত নিপীড়নের করুণ কাহিনী / ৫৬
অবরুদ্ধ বিহাচ / ৬২

ভূমিকাঃ রক্তস্নাত বোসনিয়া

দুনিয়া জুড়ে আজ মুসলিম নিপীড়নের বিভীষিকা সভ্য জগতের পথে প্রান্তরে এখন শুধুই মুসলমানের রক্তাক্ত লাশ। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার এমন কোন জনপদ নেই যেখানে মুসলমানরা শোষণ, নিপীড়ন, কিংবা হত্যাযজ্ঞের শিকার হচ্ছে না। ঈমানের দৃষ্ট চেতনায় বলিয়ান যে জাতি গোটা বিশ্বের দুয়ারে দুয়ারে শান্তি, নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধির পয়গাম পৌছে দিয়ে একটি বিজয়ী পরাক্রম জাতির মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিল সেই মুসলমানরা আজ ভিখারী, কাঙ্গাল। এরা আজ শক্তিহীন ও শোষিত। মুসলমানদের আজ কথা বলার সাহস নেই। রুখে দাঁড়াবার শক্তি নেই, বেঁচে থাকার অধিকারও যেন লোপ পেয়েছে। নিবু নিবু ঈমানের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে যেন এই জাতি এখন বিলীন হবার যোগাড়। খৃষ্টান, ইহুদী, হিন্দু এবং ধর্মনিরপেক্ষ সকল শক্তি মিলে মুসলমানদের নাম নিশানা মুছে ফেলার জন্য আজ তৎপর। আধুনিক বিশ্বের সব ধরনের প্রযুক্তি, প্রচারণা এবং কৌশল যেন এই একটি মাত্র জাতির মূল উপড়ে ফেলে দেবার জন্য সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টায় এখন নিয়োজিত। যে জাতি একদিন গোটা পৃথিবীর নিপীড়িত জনগণকে হতাশা, নিপীড়ন এবং অবহেলার হাত হতে টেনে তুলার দায়িত্ব পালন করেছিল তারাই আজ চরম ঘৃণা, অবহেলা এবং নৈশাচিক নিধনযজ্ঞের শিকার। চরম ভাগ্য বিপর্যয়ের সে এক করুণ কাহিনী।

ভারতের মুসলমানরা এখন উগ্র হিন্দু এবং ধর্মাত্মক ভারতীয় সেনাদের দ্বারা প্রতিনিয়ত নিগৃহীত। ফিলিস্তিনের মুসলমানরা আজ চারযুগ ধরে উদ্বাস্তু। তাদের ঘর নেই, ভূমি নেই, বেঁচে থাকার কোন অবলম্বন নেই। ফিলিপাইনের মরো মুসলিম জনগণ দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ করে কোন রকমে বেঁচে থাকার চেষ্টায় রত। ইউরোপ ও আমেরিকার মুসলমানরা সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দমন নীতির শিকার। আফ্রিকার অমুসলিম দেশগুলোতে মুসলমানরা চরমভাবে লাঞ্চিত। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে দীর্ঘ প্রায় ছয়যুগ ধরে মুসলমানরা নিগৃহীত হয়ে সমাজতন্ত্রের পতনের

পর এখনও তাদের ভাগ্যের কোন উন্নয়ন হয়নি। বর্তমান সময়ের সবচেয়ে ভাগ্য বিড়ম্বিত মুসলিম জনপদ হচ্ছে বোসনিয়া-হার্জেগোভিনা। সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার এই স্বাধীন রাষ্ট্র এখন মৃত্যুপুরী। খৃষ্টান সার্বিয়ান জনগণ এবং পশ্চিমা খৃষ্টান জগতের যৌথ আক্রমণে বোসনিয়ার গোটা জনপদ আজ বিবর্ণ, রক্তাক্ত। ইউরোপের এই এলাকায় খৃষ্টান হত্যাযজ্ঞ এবং বর্বরতা বিগত শতাব্দীগুলোর সকল নৃশংসতা এবং অমানবিকতাকে হার মানিয়েছে। বোসনিয়ার লাখ লাখ মানুষ হত্যা এবং হাজার হাজার মা-বোনের ইজ্জত ও সম্মান লুণ্ঠনের ঘটনা পৃথিবীর বিবেকবান সকল মানুষকেই হতবাক করে দিয়েছে। মুসলমানদের আহাজারি বোসনিয়া হার্জেগোভিণার আকাশ বাতাস বিষাক্ত করে তুলেছে। মা হারা হাজারো শিশু, স্বামী হারা অগণিত মহিলা ও ঘর হারা লাখো মানুষের চীৎকার এবং পঙ্গু, আহত ও ধর্ষিতা অসংখ্য মুসলিম মহিলার বুকফাটা আতর্নাদে বোসনিয়ার জনপদ আজ প্রকম্পিত। শুধু তাই নয়, সার্বিয়ান পশুদের অবরোধ এবং অব্যাহত গোলাবর্ষণে দেশটির পুরো এলাকার মানুষই একটি মহা আতঙ্ক এবং উত্তাপের মধ্য দিয়ে দিনযাপন করছে। তারা জানে না কখন এই নর হত্যার অবসান হবে। আদৌ এই এলাকায় কোন মুসলমানই বেঁচে থাকবে কিনা তা নিয়েও অতি সম্প্রতি সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

মুসলমানরা ছিল দুনিয়ার একটি বিজয়ী শক্তি। অশিক্ষিত, বর্বর এবং বিবেকহীন মানুষকে ইসলামের আলো-শিক্ষা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মহীমায় প্রশংসিত জাতিতে পরিণত করার ভিত্তি রচনা করে মুসলমানরাই। আজকের তথাকথিত সভ্য দুনিয়ার মানুষ মুসলমানদের নিকটই একমাত্র ঋণী। যদিও এই ঋণ অকৃতজ্ঞ ইহুদী, খৃষ্টান এবং হিন্দুরা শিকার করতে নারাজ। এরা বরং মুসলমানদের অস্তিত্বকেই মুছে ফেলার চেষ্টায় সকল শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দুনিয়ার জীবনকে ভোগ বিলাস এবং অবাধ আনন্দ দিয়ে ভরে তোলার বিকৃত মানসিকতাই তাদেরকে মুসলিম জাতি এবং ইসলামকে মুছে ফেলার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। ইসলামকে খতম করার সর্বশেষ এই কর্মসূচী গৃহীত হয় ইউরোপে ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে। তখন শ্লোগান উঠে, “খৃষ্টানদেরকে প্রতিটি মুসলমানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। প্রত্যেককে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। মুসলমানরাই গীর্জার শত্রু।” খৃষ্টান ও ইহুদীরা তাদের এই মানসিকতাকে কার্যকর করার লক্ষ্যে তাদের সকল সামরিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে তখন থেকেই কাজে লাগানোর চেষ্টা চালায়।

মুসলমানদেরকে নির্মূল করার এই কাজটিকে এরা তাদের পবিত্র এবং সার্বক্ষণিক দায়িত্ব বলে মনে করতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে খৃষ্টান, ইহুদী এবং পৌত্তলিকরা নাস্তিকতাবাদের যৌথ ভূমিকায় সমগ্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি প্রচণ্ড হামলার প্রস্তুতি নিতে উদ্যোগী হয়। প্রায় দু'শ বছর ধরে সংগঠিত ক্রুসেডের মাধ্যমে খৃষ্টানরা মুসলমানদের নিকট যে নির্মম পরাজয় বরণ করেছিল তার প্রতিশোধ হিসেবেই খৃষ্টান এবং অন্যান্যরা মুসলিম বিনাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করে বলে ধারণা। যদিও এই পরাজয়ে মুসলমানদের কোন হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়নি বিধর্মীরা। বরং তারা এটাকে তাদের সম্মানের হানি হিসেবে বিবেচনা করেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছে পরবর্তীকালে। যা শুধু বিবেচনাহীনই নয়, এটা চরম অমানবিকও বটে। সে যাই হোক, সকল মানবতাবোধ এবং বিবেক বিবেচনাকে অস্বীকার করেই খৃষ্টান ও ইহুদীরা এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মুসলিম দেশ, মুসলিম শাসন ও খেলাফত এবং মুসলমানদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, স্থাপত্য এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দেয়ার প্রক্রিয়া চালাতে থাকে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই স্পেনে মুসলিম ঐতিহ্যকে ধ্বংস করা হয়। মধ্যপ্রাচ্যের উপর খৃষ্টান ও ইহুদী আধিপত্য বিস্তার করে সেখানকার ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ঐতিহ্য বিনাশের সকল প্রচেষ্টা চালানো হয়। ফলে গোটা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো ইসলামী আদর্শ বিসর্জন দিয়ে এখন রাজতন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র কিংবা একনায়কতন্ত্রের শিকারে পরিণত। ইসলামী আদর্শ ও সমাজ ব্যবস্থা সেখানে অনুপস্থিত। শুধু তাই নয়, খৃষ্টানদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পদ সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর যাবতীয় সম্পদ এখন পশ্চিমা বিশ্ব এবং আমেরিকার দখলে। আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোও অনুরূপ খৃষ্টান প্রভাব বলয়ে অবস্থান নিতে বাধ্য হয়েছে। এদিকে এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাশিয়ার নাস্তিক্যবাদী সরকার এক ঘৃণ্যতম কায়দায় মধ্য এশিয়ার মুসলিম শাসনের অবসান ঘটায়। এখানকার মুসলিম ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে। এখানেই ক্ষান্ত হয়নি রুশ নাস্তিকেরা। এরা মুসলমানদের মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল ও মক্তবগুলোর ধ্বংস সাধন করে। রুশ প্রভাবিত এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ যেমন যুগোস্লাভিয়া, কিউবা, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, রুম্যানিয়া প্রভৃতি দেশেও মুসলিম ঐতিহ্যকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করা হয় এবং ইসলামী চেতনার মূল উৎপাটন করার চেষ্টা করা হয়। এদিকে ভারতীয় উপমহাদেশ যেমন ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি স্থানেও বৃটিশ খৃষ্টান

শাসন চলাকালে মুসলিম সংস্কৃতির কম ক্ষতি সাধন করা হয়নি। বৃটেনের নীল নকশায় এবং হিন্দুদের সহযোগিতায় এখানে মোঘল মুসলিম সাম্রাজ্যের পতন ঘটানো হয়। আজও ভারতের মুসলমান এবং তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ইবাদতগারগুলো ধ্বংস করার কাজে ঘৃণ্যতম ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে হিন্দু ভারতের ধর্মাত্ম শাসকরা। ভারতে অনেক মসজিদ ভেংগে ফেলা হয়েছে। অনেকগুলোতে তালা লাগানো হয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নামে মুসলমানদের উৎখাত করার চেষ্টা চলছে ভারতে। এ ব্যাপারে আর এস এস, শিব সেনা এবং বিজেপিকে মুসলিম হত্যার জন্য লেলিয়ে দিয়েছে সরকার।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলমানরা বিভিন্ন স্থানে তাদের আলাদা রাষ্ট্র এবং এলাকা গড়ে তুলতে থাকলেও তা ছিল খৃষ্টান, ইহুদী বা ধর্মনিরপেক্ষ, পুঁজিবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বেড়াজালে আবদ্ধ। খৃষ্টানদের পাতা আদর্শের আবরণ ভাংগতে পারেনি মুসলমানরা। বৃটিশ ও মার্কিন উপনিবেশের খতম হলেও তাদের ধ্যান-ধারণা এবং আদর্শ হতে মুক্ত কোন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন সম্ভব হয়নি। কেননা মুসলমানদের পতনের যুগের পর পুনরায় উত্থান ঘটলেও তাকে কোন ক্রমেই স্বকীয়তায় ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল না খৃষ্টান এবং মুসলিম বিরোধী শক্তিগুলো। মুসলমানরা স্বাধীনতা পেলো কিন্তু তা ছিল খুবই নিয়ন্ত্রিত এবং শর্ত সাপেক্ষ। উপনিবেশ ছেড়ে দিয়ে খৃষ্টানরা তিনভাবে মুসলিম দেশগুলোকে আবদ্ধ করে রাখে। যেমন (এক) মুসলিম দেশগুলো স্বাধীন মানচিত্র পাবে, তবে তাদের চিন্তা-চেতনার মধ্যে সার্বভৌমত্ব ভোগের কোন শক্তি বা সামর্থ্য থাকবে না। (দুই) মুসলমানরা দেশ শাসন করবে, কিন্তু তা তাদের ধর্মীয় চেতনাবোধের আলোকে নয় বরং ধর্ম হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে। (তিন) সার্বিকভাবে যথা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে মুসলমানরা কোন অগ্রগতি সাধন করতে পারবে না।

এ শতাব্দীর মুসলিম বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা খৃষ্টান, ইহুদী ও সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর এই বীভৎস অষ্টোপাশের মধ্যেই মুসলমানদের বন্দী থাকতে দেখি। মুসলমানদের আজ কোন আলাদা অস্তিত্ব নেই, রাজনৈতিক কোন ফোরাম নেই, ধর্মীয় কোন শক্তিশীল ঐক্য নেই, নেই অর্থনৈতিক বলিষ্ঠতাও। বরং দলীয়, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় সংকীর্ণ রাজনৈতিক ভেদাভেদ ও হানাহানিই লেগে আছে মুসলমানদের মধ্যে। ফলে ছোট্ট একটি ভূখণ্ড এবং কয়েক লক্ষ ইহুদী ইসরাইলের নিকট মধ্যপ্রাচ্যের কোটি কোটি মানুষের জীবন আজ বন্দী। দুনিয়ায়

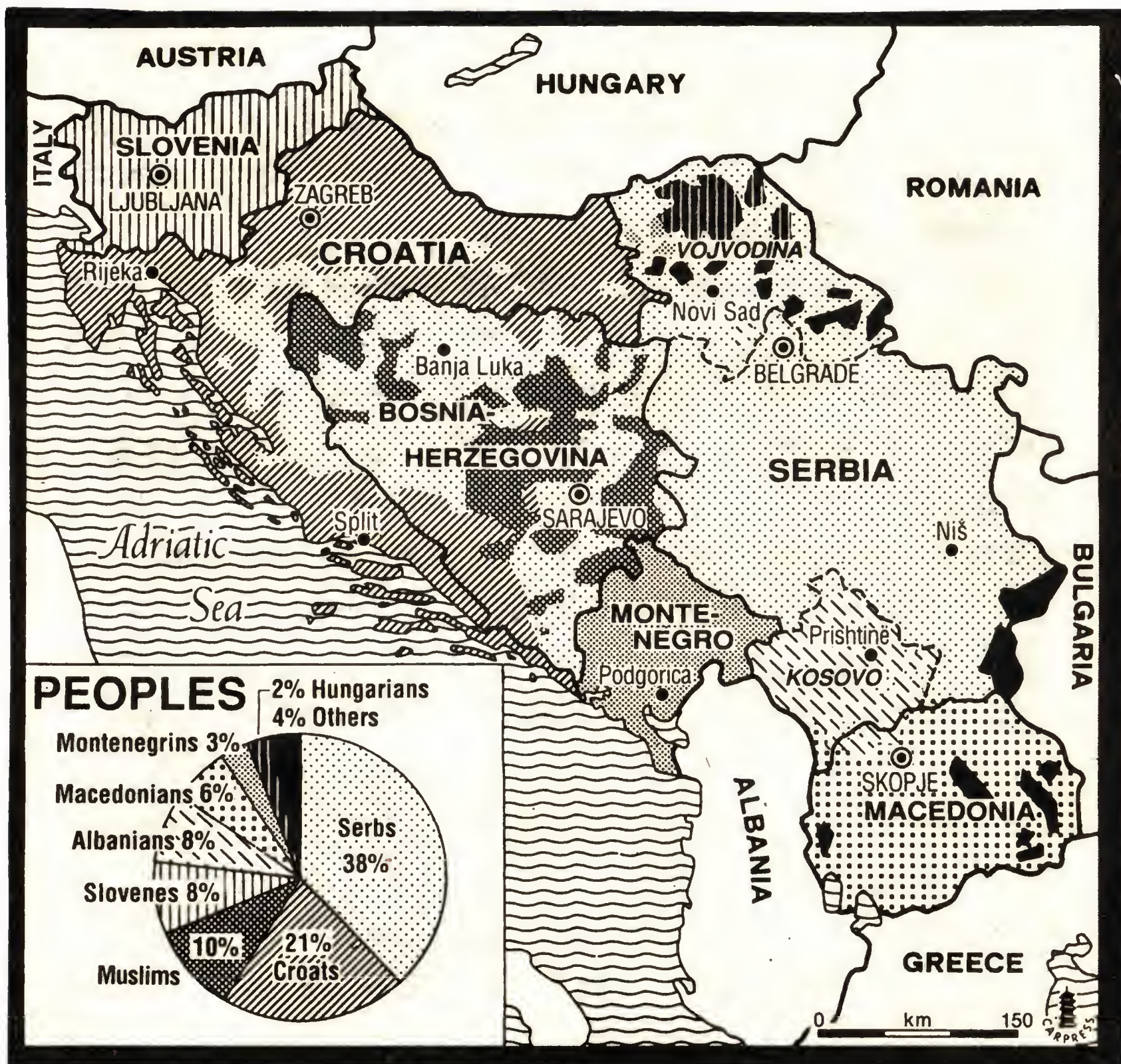
একশত বিশ কোটি মুসলমান থাকলেও সর্বত্র এরা নির্যাতিত ও নিপীড়িত। জাতিসংঘে মুসলিম দেশগুলোর অস্তিত্ব থাকলেও এরা সেখানে শক্তিহীন ও দুর্বল। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ৫২টি মুসলিম দেশ আজ পশ্চিমাদের ভয়ে নির্বাক। অথচ সম্পদ এবং শক্তিতে মুসলমানরা এককভাবে উদীয়মান একটি শক্তি যা যে কোন শক্তির মোকাবেলা করতে সক্ষম। অথচ অনৈক্য, আদর্শ থেকে বিচ্যুতি, ধর্মীয় এবং গোষ্ঠীগত ঐতিহ্যের চেতনাবোধের অভাব এবং সর্বোপরি রুখে না দাঁড়াবার হীন মানসিকতা মুসলিম দেশগুলোর কপালে পরাধীনতা এবং লাঞ্ছনার কলঙ্ক তীলক পরিয়ে রেখেছে।

বোসনিয়া-হার্জেগোভিনায় আজ যে হত্যাযজ্ঞ চলছে তাতে গোটা বিশ্বের মানুষ এখন বেশ উদ্বিগ্ন। অনেকেরই ধারণা এই নিধন কাজটি ইউরোপে একটি মুসলিম জনপদকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেও এ আগুনের বহিঃশিখা দুনিয়ার অনেক জনপদকেই করে তুলবে উত্তপ্ত। তাছাড়া ইসরাইলকে দিয়ে লেবাননের মুসলমানদের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়েছে পশ্চিমা শক্তিগুলো। ফলে লক্ষ লক্ষ লেবাননী নিরাপরাধ এবং সহায়হীন মানুষ পরিণত হয়েছে উদ্বাস্তুতে।

সদ্য শত্রুমুক্ত দেশ আফগানিস্তানের সরকারকে অস্থির করে তোলার জন্য রাশিয়া আফগান গ্রামে সম্প্রতি বিমান হামলা পরিচালনা করেছে। কোন কারণ ছাড়াই খোঁড়া অজুহাত তুলে আফগানিস্তানে মুসলিম নিরাপরাধ জনগণকে হত্যা করার পেছনেও পশ্চিমাদের একই পরিকল্পনা কাজ করছে। তারা চাচ্ছে মুসলিম বিশ্বকে নানাভাবে সন্ত্রস্ত এবং বিব্রতব্র অবস্থায় রেখে দুর্বল করে দিতে। এ ক্ষেত্রে রাশিয়াকেও কাজে লাগানো হচ্ছে সম্প্রতি রাশিয়া তার নিজ ঘরের আগুন নিয়ে যখন খুবই নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে নিপতিত ঠিক তখনই তাজাক এবং আফগান সীমান্তের বরাবর আফগান গ্রামে হামলা চালিয়ে একাধারে নিজ দেশের সমসাকে ঢেকে রাখার প্রয়াস চালাচ্ছে অন্যদিকে আফগানিস্তান এবং তাজাকিস্তানের মুসলমানদের হত্যার কাজটিও সেরে নিচ্ছে। তাছাড়া সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত আজারবাইজানের সার্বভৌমত্বকে নস্যাত করার জন্যও রাশিয়া খৃষ্টান অধ্যুষিত আর্মেনিয়াকে মদদ দিয়ে যাচ্ছে। একথা সবারই জানা যে, রাশিয়া বোসনিয়া সংকটে সার্বদের ঘোরতর সমর্থক। সার্বিয়ায় সমরাস্ত্র থেকে রসদ পর্যন্ত সব ধরনের সাহায্য যুগিয়ে যাচ্ছে রুশ শাসকরা। এদিকে বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী, ইসরাইল এবং জার্মানীও অনুরূপ অস্ত্র এবং বৈষয়িক সহযোগিতা প্রদান করছে নরঘাতক সার্বিয় সরকারকে। এই রাশিয়াই চেকনিয়ার মুসলমানদের উৎখাত

সামরিক শক্তি নিয়ে জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

এমনি যখন অবস্থা তখন মুসলিম বিশ্বের ভূমিকা খুবই ন্যাঙ্কারজনক বলেই মনে হচ্ছে। বোসনিয়ার মুসলমানরা যখন চরম নিপীড়ন, হত্যা এবং বিতাড়নের শিকার গোটা মুসলিম বিশ্ব সেই মুহূর্তে নিষ্ক্রিয় এবং নির্বাক। মুসলিম শাসকদের মনে বোসনিয়া-হার্জেগোভিনার আতঁপীড়িত মানুষের গগন বিদারী আতঁনাদ যেন কোন উত্তাপ এবং উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারছে না। এই হতাশাজনক ব্যর্থতা ও নিষ্ক্রিয়তা সত্যিই দুঃখজনক। গোটা বিশ্বের মুসলিম জনগণের জন্যও মুসলিম শাসকদের চরম উদাসীন্য এবং অবহেলা একটি বড় উদ্বেগের কারণ বৈকি। বোসনিয়ায় আজ যে হত্যাকাণ্ড চালানো হচ্ছে, ভারতে মুসলমানদের জবাই করা হচ্ছে, লেবানন ও ফিলিস্তিনের মানুষকে দিনের পর দিন নিঃশেষের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে আলজেরিয়ার ইসলামী বিপ্লবকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে তা নিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব পরিতৃপ্ত এবং উল্লসিত হলেও এই অন্যায় অবিচারের পরিণাম যে কতটা ভয়াবহ তা তলিয়ে দেখা দরকার। এই অশান্তি ও অত্যাচারের আগুন ইউরোপ এবং আমেরিকাকেও যে গ্রাস করতে উদ্যত হবে তার আলামত ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। ইউরোপ ও আমেরিকার বিবেকবান মানুষ এতে ঘৃণা জানাচ্ছে এবং সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। তাছাড়া নিগৃহীত ও বিতাড়িত মুসলিম জনগোষ্ঠী ক্রমেই হয়ে উঠছে বেপরোয়া এবং উগ্র। এই বেপরোয়া এবং অনিশ্চিত জীবন তাদেরকে ইউরোপ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে করে তুলছে বিদ্রোহী। তাই এরা এক সময় গোটা ইউরোপ ও আমেরিকার সমাজকে অস্থির করে তুলতে পারে এমন আশঙ্কাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তাই বিদ্রোহের আগুন সবখানে ছড়িয়ে পড়ার আগেই বিশ্বব্যাপী মুসলিম হত্যা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। বিশ্ব শান্তির স্বার্থেই তা বড় প্রয়োজন।



বোসনিয়ার ইতিহাস

সাবেক যুগোস্লাভিয়ার একটি অন্যতম প্রজাতন্ত্র হলেও বোসনিয়া-হার্জেগোভিনা দীর্ঘদিন হতে বেশ অনুরত হয়ে রয়েছে। এখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায় মুসলিম জনগোষ্ঠী কোন সুযোগ সুবিধাই লাভ করতে পারেনি। যদিও ক্রোয়াট এবং সার্বরা কমিউনিষ্ট সরকারের আমলে বেশ অনুগ্রহ এবং সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হয়। এক সময়ে বোসনিয়া ছিল উগ্র প্রকৃতির খৃষ্টান শাসকদের অধীন। এরাও মুসলমানদের কোন উন্নয়ন ঘটতে দেয়নি। স্লোভিনিয়া নামক সম্প্রদায় খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বোসনিয়া হার্জেগোভিনার গোড়া পত্তন করে। বোসনাক নামক একটি সম্প্রদায়ের নামানুসারে বোসনিয়া নামকরণটি করা হয়। স্লোভিনিয়া সম্প্রদায় ১৪শ' খৃঃ পর্যন্ত বোসনিয়া-হার্জেগোভিনায় তাদের গোত্রীয় শাসন কায়েম রাখে। এরপর তুর্কী সালতানাতের ক্রম বিকাশের ধারায় বোসনিয়া মুসলমানদের দখলে আসে। এখানে উল্লেখ্য যে, তুর্কী সুলতান প্রথম মুরাদ (১৩৬০-১৩৮৯) কনস্টান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুল জয় করার দু'বছর পর ইউরোপের বুলগেরিয়া, মেসিডোনিয়া এবং সার্বিয়ার কিয়দংশ দখল করেন। কসোভার বৃহৎ যুদ্ধ সংগঠিত হলে তিনি বিজয়ী হন এবং মারা যান। ফলে বর্তমান যুগোস্লাভিয়ার বিশাল অঞ্চল তিনি করায়ত্ত করে যেতে পারেননি। তারপর তুর্কী সালতানাতের ক্ষমতায় বসেন প্রথম বায়েজীদ ইলাদেরীম (১৩৮৯-১৪০২)। তিনি ক্ষমতায় এলে হাঙ্গেরিয়ান রাজা সিজিসমন্ডের প্রেরণায় ইংল্যান্ড, জার্মানী, ফ্রান্স এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাথে এক ভয়াবহ ক্রুসেড সংগঠিত হয়। এতে বায়েজীদ বিজয়ী হন। তখন বোসনিয়ার দক্ষিণাংশ মুসলমানদের অধিকারে আসে। ইলাদেরীমের পর তুর্কী সাম্রাজ্যের হাল ধরেন সুলতান মুহাম্মদ আল ফাতহ (১৪৫১-১৪৮১)। তিনি ১৪৬৩ সালে বোসনিয়া-হার্জেগোভিনার সমস্ত এলাকা জয় করে সেখানে মুসলিম শাসন কায়েম করেন। তিনি এই অঞ্চলটি জয় করতে তেমন কোন বাধার সম্মুখীন হননি। উল্লেখ্য যে,

এই সময় বোসনিয়া-হার্জেগোভিনার মানুষ বোগমিল খৃষ্টান শাসকদের দ্বারা বেশ অত্যাচারিত ছিল। ইসলামের সৌন্দর্য, সাম্য, স্বাধীনতা, ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার এবং শ্রেষ্ঠত্বে মুগ্ধ হয়ে তুর্কী সুলতানের ভূখণ্ড বিজয়ের সাথে সাথেই অধিকাংশ লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য যে, বোসনিয়া-হার্জেগোভিনার বিখ্যাত এবং শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় ছিল বোসনাক। এ সম্প্রদায়ের সকল লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, একদিনেই ৩৬ হাজার লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। মুসলমানদের এই বিজয় ছিল খৃষ্টানদের জন্য অত্যন্ত বেদনার বিষয়। তারা মুসলমানদের এই অভূতপূর্ব বিজয় এবং সৌন্দর্যকে মেনে নিতে পারেনি এবং তার প্রতিক্রিয়া কোন দিনই ভুলে যায়নি। আজ সেখানে যে অমানবিক নিপীড়ন এবং মুসলিম নিধন চলছে তা সেই যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি এবং বিদ্বেষ হতেই উদ্ভূত। যদিও মুসলমানদের এই বিজয় ছিল শান্তি, নিরাপত্তা, বাধাহীন ও রক্তপাত বিবর্জিত। সে যাই হোক, বোসনিয়া-হার্জেগোভিনা প্রায় ৪০০ বছর মুসলিম শাসনের অধীন ছিল। এই সময় এখানে ছিল সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তা। কিন্তু তখনও মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃষ্টান জগত ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে।

ইউরোপের উগ্র খৃষ্টান সম্প্রদায়গুলো মুসলমানদের ইউরোপ হতে নিঃশেষ করে দেয়ার জন্য বেশ তৎপর হয়ে উঠে এবং ক্রমান্বয়ে প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করে। খৃষ্টীয় ১৮৭৭ সালে এই উগ্র ও বিদ্বেষী খৃষ্টানরা সম্মিলিতভাবে তুর্কী সালতানাতের ওপর সর্বাত্মক যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। তখন তুর্কী সাম্রাজ্যের নৈতিক এবং বৈষয়িক শক্তি ছিল খুবই জীর্ণশীর্ণ এবং নড়বড়ে। ফলে খৃষ্টানদের সম্মিলিত হামলা মোকাবেলা করা ব্যর্থ হলে ১৮৭৮ সালে বোসনিয়া-হার্জেগোভিনা হতে তুর্কী মুসলিম শাসনের অবসান হয়। এই সময় মুসলমানরা খৃষ্টানদের সাথে অপমানজনক “স্যান স্টিফানো” চুক্তিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয় এবং এরই মধ্য দিয়ে বোসনিয়া-হার্জেগোভিনা অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যবাদের দখলে চলে যায়। এই সময় হতেই মূলত অত্র এলাকায় মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়। এখানে বলা আবশ্যিক যে, ১৯০৮ সালে বোসনিয়া-হার্জেগোভিনা হতে চূড়ান্তভাবে তুর্কী শাসনের অবসান হয়। পুরো দেশে ঝোঁকে বসে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী শাসন। মুসলমানরা ক্রমেই হয়ে পড়ে কোনঠাসা। ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুসলমানরা শাসক গোষ্ঠী, স্থানীয় সার্ব এবং ক্রোয়াট খৃষ্টানদের দ্বারা বঞ্চনার শিকার হতে থাকে।

এই সময় শ্লোভেন, ক্রোয়েশিয়ান এবং সার্বিয়ান জাতীয়তাবাদীরা অস্ট্রিয়-হাঙ্গেরী শাসনের বিরোধিতা করতে থাকে এবং তা ক্রমেই শক্তি অর্জন করে। এই বিক্ষোভ যখন চলছিল তখন ১৯১৪ সালের ২৮শে জুন অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ও অস্ট্রিয় হাঙ্গেরীয়ান আর্চ ডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিনান্ড বোসনিয়ান জাতীয়তাবাদী জ্যাভরিলো প্রিন্সপের হাতে নিহত হন। সারিয়েভো শহরের এই হত্যাকাণ্ড বোসনিয়ান জাতীয়তাবাদী জ্যাভরিলো প্রিন্সপের হাতে নিহত হন। সারিয়েভো শহরের এই হত্যাকাণ্ড ইউরোপে এক প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এরই সূত্র ধরে শুরু হয় ভয়াবহ প্রথম মহাযুদ্ধ। গোটা বিশ্বের অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি এবং বিপুল পরিমাণ সম্পদ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে এক সময় প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়। তখন ইউরোপের মানচিত্র বেশ বদলে যায়। বোসনিয়ায় অস্ট্রিয়-হাঙ্গেরী শাসনের পতন হয়। সার্বিয়ার রাজা আলেকজান্ডার এই সময় বোসনিয়া দখল করে নেন। তিনি শ্লোভিনিয়া, ক্রোয়েশিয়া এবং মন্টেনেগ্রোও অধিকার করে নেন। ১৯১৮ সালে এই সব অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় যুগোস্লাভ ফেডারেশন। সার্ব জাতিগোষ্ঠীর খৃষ্টান শাসকরা দেশ শাসন করতে থাকে তখন হতেই। এই সময় হতে মুসলমানদের উপর নেমে আসে প্রচণ্ড রকমের নিপীড়ন। সার্ব শাসকরা মুসলমানদের ঐতিহ্য, তমুদুন, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উপর আঘাত হানে। তারা মুসলিম মসজিদ, মসজিদ এবং মসজিদগুলোর ক্ষতি সাধন করতে থাকে। মুসলমানরা খৃষ্টানদের চরম হিংসা এবং বিদ্বেষের শিকার হলে ইসলাম হয়ে পড়ে হুমকির সম্মুখীন। এভাবে এক সময় খৃষ্টীয় ১৯৩৯ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪১ সালে জার্মানী সার্বিয়া দখল করে নেয় এবং বোসনিয়াও তখন জার্মান সেনাবাহিনীর হাতে চলে যায়। কিন্তু মহাযুদ্ধের শেষদিকে জার্মানীর অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে ওঠে এবং তার পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যায়। এমনি সময়ে ১৯৪৪ সালে মার্শাল বোসেফ ব্রজ টিটো শ্লোভিনিয়া, সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, মন্টেনেগ্রো, বোসনিয়া এবং মেসিডনিয়া নিয়ে একটি ফেডারেল যুগোস্লাভিয়া গঠন করেন। ১৯৪৫ সালে গোটা যুগোস্লাভিয়ায় প্রতিষ্ঠা করা হয় কমিউনিষ্ট শাসন। এই সময় হতে বোসনিয়া-হার্জেগোভিনাসহ যুগোস্লাভ ফেডারেশনের সর্বত্র মুসলমানদের উপর নেমে আসে অমানুষিক নিপীড়ন। মার্শাল টিটোর ক্ষমতা লাভের আগেই বেলগ্রেড শহরের ২৭০টি মসজিদ এবং ২৭০টি প্রাথমিক মাদ্রাসা এবং মসজিদ সার্ব খৃষ্টানরা ভেঙ্গে ফেলে এবং সেই সব স্থানে হোটেল এবং রঙ্গমঞ্চ তৈরি করে। মার্শাল টিটো ক্ষমতায় আরোহণ করে কমিউনিজম কায়েম করার পদক্ষেপ নিলে মুসলমানরাই

তার চক্ষুশূলে পরিণত হয়। মুসলমানদের নিঃশেষ করার যাবতীয় ব্যবস্থা নেন তিনি। বোসনিয়াসহ গোটা যুগোস্লাভিয়ার মুসলমানরাই তখন নিপীড়ন ও বঞ্চনার শিকার হয়। মুসলিম আলেম এবং শিক্ষকদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। কোরআন এবং ইসলামী শিক্ষার যাবতীয় পুস্তিকার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। মুসলমানদের ধর্মীয় সব প্রতিষ্ঠানকে ভেঙ্গে ফেলা হয় অথবা বন্ধ করে দেয়া হয়। বোসনিয়া-হার্জেগোভিনার মুসলমানরাও একই কায়দায় নিপীড়িত এবং নিগৃহিত হতে থাকে।

খৃষ্টীয় ১৯৮০ সালে যুগোস্লাভ প্রেসিডেন্ট ব্রজ টিটোর মৃত্যু হলে ক্ষমতায় আসেন কোলেসভেসিক। এই সময় গোটা পূর্ব ইউরোপ সমাজতন্ত্র হতে মুক্তি পাবার জন্য বন্দী মানুষের আন্দোলন ক্রমাগতভাবে জেগে উঠেছিল। যুগোস্লাভিয়ার বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রও এই সময় আন্দোলিত হয় স্বাধীনতার চেতনায়। ১৯৯১ সালে স্লোভেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বোসনিয়া-হার্জেগোভিনার মুসলমানরাও এতে বসে থাকেনি। ১৯৯২ সালের পহেলা মার্চ দেশটি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। স্বাধীনতা ঘোষণার পর বোসনিয়া-হার্জেগোভিনা ইউরোপীয় জোট এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করে এবং ১৯৯২ সালের মে মাসে দেশটি জাতিসংঘের সদস্যপদ ও অর্জন করে।

বোসনিয়া পরিচিতি

পূর্ব ইউরোপের দেশ যুগোস্লাভিয়ার ছয়টি প্রজাতন্ত্রের একটি বোসনিয়া-হার্জেগোভিনা। দেশের মধ্যভাগে বোসনিয়া এবং হার্জেগোভিনা দুটি প্রদেশ মিলে এই প্রজাতন্ত্র অবস্থিত। এর উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণে ক্রোশিয়া, পূর্বে সার্বিয়া এবং পূর্ব দক্ষিণে মন্টেনেগ্রো অবস্থিত। ভূমধ্য সাগরের সুন্দর বায়ুমণ্ডলের স্পর্শে এক অপূরণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘিরে রেখেছে এই অঞ্চলটিকে। দেশটির পুরো নাম রিপাবলিক অব বোসনিয়া-হার্জেগোভিনা। রাজধানী সারায়েভো। আয়তন ১৯,৯৪০ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ৪৩,৬৬,০০০। লোক সংখ্যার ৪৪% মুসলিম ৩১% সার্ব, ১৭% ক্রোয়াট এবং বাকি ৮% অন্যান্য জাতিসত্তার লোক। ধর্মীয় দিক হতে ৪৪% লোক মুসলমান, ২৮% ক্রিষ্টিয়ান এবং ১৮% লোক রোমান ক্যাথলিক। মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও দরিদ্র এবং সামাজিকভাবে অনগ্রসর। টিটোর কমিউনিস্ট শাসনের অধীনে মুসলিম জনগোষ্ঠীর কোন উন্নয়ন ঘটতে পারেনি বলেই এই অবস্থা।

ইতিহাসের যুগোস্লাভিয়া

যুগোস্লাভিয়ার প্রাচীন অধিবাসী ছিল ইলিরিয়ান কেন্‌টরা। আড্রিয়াটিক সাগরের তীরে বেশ কিছুসংখ্যক গ্রীক এসেও উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এক সময়। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে রোমানরা এসে এই ভূখণ্ড দখল করে নিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ইলিরিয়া প্রদেশের গোড়া পত্তন করে। সপ্তম শতক হতে স্লাভরা এই অঞ্চলে আসা শুরু করে। ধীরে ধীরে তারা গ্রাস করে নেয় পুরো ভূখণ্ড। স্লাভদের নিয়ন্ত্রণে সার্বিয়া, বোসনিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র গড়ে উঠে। কালক্রমে চতুর্দশ শতাব্দীতে তুর্কীরা এই অঞ্চল দখল করে নেয়। ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত বোসনিয়া-হার্জেগোভিনাসহ যুগোস্লাভিয়ার বিশাল এলাকা তুর্কী সুলতানদের শাসনাধীনে থাকে। এরপর এক সর্বাঙ্গিক যুদ্ধে খৃষ্টানরা মুসলমানদের পরাজিত করে অত্র এলাকা অধিকার করে নেয় এবং এক চুক্তি বলে যুগোস্লাভিয়ার গোটা অঞ্চলে অস্ট্রিয়-হাঙ্গেরী শাসনের শুরু হয়। ১৯১৪ সালের জুনে জাতীয়তাবাদীদের হাতে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিন্যান্ড নিহত হলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। অস্ট্রিয়া কর্তৃক সার্বিয়া আক্রমণের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় প্রথম মহাযুদ্ধ। এক বছরের বেশি সময় ধরে সার্বিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করে। কিন্তু তারা মন্টিনিগ্রোর দিকে পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হয়। ১৯১৬ সালে মন্টিনিগ্রোরও পতন ঘটে অস্ট্রিয়ানদের হাতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী এবং তার মিত্রদের পরাজয় ঘটলে সার্বিয়দের তীব্র প্রতিরোধের মুখে দখলদার অস্ট্রিয়া দেশ হতে বিতাড়িত হয়। ১৯১৮ সালের ৬ থেকে ৯ই নভেম্বর জেনেভায় “যুগোস্লাভ কমিটির” উদ্যোগে আয়োজিত এক সম্মেলনে দক্ষিণ স্লাভ গোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলের ভবিষ্যত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যার মধ্যে সার্বিয়া ছাড়াও ক্রোয়েশিয়া, বোসনিয়া, শ্লোভেনিয়া, ম্যাসিডনিয়া ও মন্টিনিগ্রোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের নামকরণ করা হয় যুগোস্লাভিয়া। ১৯২১ সালে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। ১৯২৯ সালে রাজার নেতৃত্বে অভ্যুত্থান ঘটে এবং পাঁচ বছরের জন্য একচ্ছত্র রাজতন্ত্র কায়েম করে ও প্রবল বিমান আক্রমণে রাজধানী বেলগ্রেড বিধ্বস্ত করে দেয়। এই সময় দেশটি জার্মানীর ফ্যাসিস্ট বাহিনীর দখলে চলে যায়। জার্মানীর এই দখলের বিরুদ্ধে টিটোর নেতৃত্বে গণমুক্তি বাহিনী গড়ে তুলে তীব্র প্রতিরোধ। তিন বছরে মধ্যে গণমুক্তি বাহিনী জার্মানের কবল হতে প্রায় অর্ধেক এলাকা মুক্ত করে ফেলতে সক্ষম হয়। পরে ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপে ন্যাৎসী শক্তির পতনের পর কমিউনিস্ট নেতা মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে দেশটি গণপ্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় এবং তিনিই হন দেশের প্রেসিডেন্ট। যুদ্ধকালীন সময়ে দেশের দেড় কোটি মানুষের মধ্যে সাড়ে সতের লাখ লোক নিহত হয়। দেশটি ৬টি প্রজাতন্ত্রে বিভক্ত ছিল। এগুলো হচ্ছে (১) সার্বিয়া, (২) মন্টিনিগ্রো, (৩) মেসিডনিয়া, (৪) স্লোভিনিয়া, (৫) ক্রোশিয়া এবং (৬) বোসনিয়া-হার্জেগোভিনা। এর মধ্যে বোসনিয়া-হার্জেগোভিনা হচ্ছে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাবলিক।

যুগোস্লাভিয়ার ছয়টি প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং বহুভাষী মানুষের বাস। এর মধ্যে কোন কোনটিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে কোন একটি গোষ্ঠী বা জাতির। যেমন স্লোভেনিয়ার ৯৫% স্লোভেন এবং ৫% অন্যান্য, ক্রোয়েশিয়ার ৮০% ক্রোয়েট, ১২% সার্ব এবং ৮% অন্যান্য, বোসনিয়ার ৪৪% মুসলিম, ৩১% সার্ব, ১৭% ক্রোয়াট এবং ৮% অন্যান্য, সার্বিয়ার ৬৬% সার্বিয়ান, ১৮% আলবেনিয়ান, ৪% হাঙ্গেরিয়ান, ৪% মুসলিম এবং ৯% অন্যান্য, মেসিডনিয়ার ৬৭% ম্যাসিডনিয়ান ২০% আলবেনিয়ান সার্ব এবং ১১% অন্যান্য আর মন্টেনিগ্রোর ৯৫% মন্টেনিগ্রান এবং ৫% অন্যান্য গোত্র বা জাতির মানুষ। যুগোস্লাভিয়ার জনসংখ্যার বেশির ভাগই খৃষ্টান। কিছু অর্থোডক্স এবং কিছু রোমান ক্যাথলিক। শতকরা ১০ জন মাত্র মুসলিম। এতে কমিউনিস্ট শাসনামলে যুগোস্লাভিয়ায় গোত্র বা জাতিগত সংঘাত তেমন দেখা না গেলেও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার ফলে যুগোস্লাভিয়ার গোটা দেহে জাতিগত দাঙ্গা এবং বিরোধ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। যুগোস্লাভ প্রজাতন্ত্রগুলোর মধ্যে স্লোভেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া ১৯৯১ সালের পহেলা মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়। ওদিকে সার্বিয়া যুগোস্লাভ রাষ্ট্রের উত্তরাধিকার দাবি করে তার অস্তিত্ব ধরে রাখার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে আর মন্টেনিগ্রো সার্বিয়ার সাথে একটি নতুন যুগোস্লাভিয়ায় থাকার জন্য গত বছর ভোট প্রদান করেছে।

যুগোস্লাভিয়ায় গৃহযুদ্ধ

১৯৪৫ সালে টিটোর নেতৃত্বে একটি কমিউনিষ্ট ফেডারেল যুগোস্লাভিয়া গঠন করা হয় ছয়টি প্রজাতন্ত্র নিয়ে। অভিপ্রায় ছিল বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিলোপ করে এবং ধর্মীয় বিভাজনকে একাকার করে দিয়ে একটি কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র গঠন করা যার মধ্যে থাকবে না কোন ধর্মীয়, গোষ্ঠীগত বিভেদ। মার্শাল টিটোর সে প্লান বাস্তবায়নের জন্য তিনি হরণ করেছিলেন বাক স্বাধীনতা এবং কায়েম করেছিলেন প্রচণ্ড স্বৈরশাসন। যুগোস্লাভিয়াকে একটি বন্দী শিবিরে পরিণত করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৮৯ সালে তার ক্ষমতা হতে বিচ্যুত হবার ঘটনা যুগোস্লাভ ফেডারেল সরকারের ভিত নড়ে দেয়। নতুন সরকার জনগণের উত্তাপ ও বিদ্রোহ অনুধাবন করতে সক্ষম হন। যদিও তা টিটোর যুগের শেষদিক হতেই অঙ্কুরিত হচ্ছিল। বঞ্চনা এবং একদলীয় শাসনের প্রচণ্ড অমানবিকতা বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষকে আন্দোলিত করে তুলে। তারা কমিউনিষ্ট সরকারের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলে। এমনি সময় কমিউনিজমের মাতৃভূমি সোভিয়েত ইউনিয়নে জনগণের জাগরণ, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের পতন যুগোস্লাভিয়াকে আরেক ধাপ এগিয়ে দেয়। সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে গেলে যুগোস্লাভিয়ার বিভিন্ন প্রজাতন্ত্র স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে শুরু করে। এরই প্রেক্ষিতে স্লোভেনিয়া এবং ক্রোশিয়া ১৯৯১ সালের ২৫শে জুন স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং পশ্চিমা বিশ্বের স্বীকৃতিও লাভ করে। মেসেডনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও পশ্চিমা স্বীকৃতির অভাবে তা স্বাধীনভাবে তার দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে না বলে পূর্বাবস্থায়ই রয়ে গেছে। কিন্তু বোসনিয়া-হার্জেগোভিনার স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে দাবি উঠলে তা নিয়ে ঘটে যায় এক অমানবিক ঘটনা। এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কথা বিবেচনা করে অত্র এলাকাটিকে সহজে স্বাধীনতার ব্যাপারে বাঁধ সাধে পশ্চিমা এবং ইউরোপীয় গোষ্ঠী। তারা দেশটিতে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করে। প্রস্তাবানুযায়ী ১৯৯২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী এবং পহেলা মার্চ গণভোট

অনুষ্ঠিত হয়। জনগণের ৯৯% ভোট স্বাধীনতার পক্ষে পড়লে পহেলা মার্চ দেশটি স্বাধীন হয়। ৬ই মার্চ জাতিসংঘ এবং ইউরোপীয় গোষ্ঠী বোসনিয়া-হার্জেগোভিনাকে স্বীকৃতি দেয়। এদিকে ১৯৯২ সালের ২৭শে এপ্রিল সার্ব প্রভাবিত যুগোস্লাভ পার্লামেন্ট সার্বিয়া এবং মন্টেনেগ্রোকে নিয়ে নতুন যুগোস্লাভ ফেডারেশনের ঘোষণা দেয়। এরপরই সার্ব শাসক দেশের সর্বত্র এক গৃহযুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি করে। এখানে উল্লেখ্য যে, সাবেক যুগোস্লাভিয়ার অর্থনীতি, সামাজিক এবং যাবতীয় রাষ্ট্রীয় সুবিধাদি সার্বিয়ার অধীনে থেকে যায়। ফলে সার্বিয়ার ফেডারেশন অন্যান্য প্রজাতন্ত্রগুলোর চেয়ে শক্তিশালী থেকে যায়। সার্বিয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাক্তন প্রজাতন্ত্রগুলোতে সার্ব জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠা এবং ক্রমান্বয়ে একটি বিশাল সার্বিয়ান রাষ্ট্র গড়ে তোলা। ফলে শ্রোভেনিয়া, ক্রোশিয়া এবং বোসনিয়ার সর্বত্র গর্জে উঠে গৃহযুদ্ধের ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা। শুরু হয় রক্তপাত, হানাহানি এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ। এই পরিণতির জন্য প্রধানতঃ সার্ব এবং ক্রোটরাই দায়ী। কারণ, এই দুই পক্ষের মধ্যে রয়েছে ঐতিহাসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিরোধ। ক্রোটদের মতে, বৃহত্তর সার্বিয়া গঠনের লক্ষ্যে ক্রোশিয়ার স্বাধীনতা নস্যাৎ করার জন্য সার্বিয়া সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে। আর সার্বিয়ার মতে ক্রোশিয়ার গণহত্যা হতে সার্বদের রক্ষা করার জন্যই এই যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে। এই যুক্তি সঠিক না হলেও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংযুক্ত যুগোস্লাভ শাসনের সময় হতেই ছিল দ্বন্দ্ব এবং বিরোধ। সার্বরা বরাবরই ছিল রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের আনুকূল্য প্রাপ্ত গোষ্ঠী। শাসনকার্য পরিচালনা এবং ক্রোশিয়া ও শ্রোভেনিয়া গঠনেও সার্বরা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। সার্বদের দাবী হলো যুগোস্লাভিয়া গঠন হয়েছিল তাদেরই সামরিক শক্তির বলে। সার্বিয়ার বিজ্ঞান ও শিল্পকলা একাডেমীর সদস্য পাভেল আইভিকের মতে, ‘ক্রোশিয়া এবং শ্রোভেনিয়ার বলতে গেলে কোন ইতিহাস নেই এবং তারা কখনই জাতিসত্তার জন্য লড়াই করেনি।’ সার্বরা সবসময়ই সংযুক্ত যুগোস্লাভের শাসক ছিল। তারা দাবি করছে গোটা রাষ্ট্রকে সংগতির চেতনায় উজ্জীবিত করেছে ওরাই এবং ক্রোশিয়া সব সময়ই পৃথক থেকেছে। কিন্তু মার্শাল টিটোই সার্বদের ঐক্য এবং সংহতিকে বিনষ্ট করেছে বলে সার্বদের ধারণা। কারণ, তিনি ছিলেন ক্রোশীয় বংশোদ্ভূত। তিনি সার্বিয়ার উন্নয়নে তেমন কোন মনোযোগ দেননি। বরং অন্যান্য প্রজাতন্ত্রগুলোকে আনুকূল্য দিয়েছেন। ক্রোশিয়ারা দাবি করছে, সার্বদের এই ধারণা সঠিক নয়। কারণ টিটোর সেনাবাহিনীর ৭০ শতাংশ সেনা অফিসার হচ্ছে সার্বিয়ান। এইভাবে সার্বরা শ্রাব ও ক্রোয়াটদের বিরুদ্ধে একটি ভিত্তিহীন

ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে সেখানে জ্বরদষ্টি চালায় এবং প্রজাতন্ত্রগুলোকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়। ১৯৯১ সালে স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে সাথে সার্বরা সহিংস হয়ে উঠে। তারা সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেয় ঐসব অঞ্চলের মানুষের উপর এবং স্থানীয় সার্ব জনগণকেও কাজে লাগায়। ফলে দুই লক্ষাধিক স্নাত এবং ক্রোয়াট নিহত হয়। আশ্রয়হারা হয় আরো কয়েক লক্ষ মানুষ।

এমনি অবস্থায় ১৯৯২ সালের পহেলা মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করে বোসনিয়া-হার্জেগোভিনার মানুষ। এই স্বাধীনতার ঘোষণা সার্ব শাসকের মাথা ঘুরিয়ে দেয়। খৃষ্টান সার্বরা তুর্কীদের হাতে পরাজয়ের পর সেই তেরশ শতক হতেই মুসলমানদের উপর ক্ষিপ্ত এবং খড়্গহস্ত। এরা স্বাধীনভাবে একটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব নিয়ে যুগোস্লাভ ফেডারেশনের পাশে থাকবে আর সার্বরা এদের অধীনে সংখ্যালঘু হয়ে বসবাস করবে এটা সার্বিয়ার শাসকরা মেনে নিতে পারেনি। তাই ইউরোপীয় গোষ্ঠীর স্বীকৃতি লাভ এবং জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করার পরও সার্বিয়া বোসনিয়া-হার্জেগোভিনার স্বাধীন ভূমিতে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে এবং চালায় অমানবিক নিপীড়ন, হত্যা, সন্ত্রাস এবং ধর্ষণ। ক্রোট, স্নাত এবং সার্বদের মধ্যে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তা ক্রমে স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং বোসনিয়াকে পরিণত করা হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। আজ এই গৃহযুদ্ধ মানব ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কজনক এবং ভয়াবহ পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। সার্বদের নির্যাতনের সাথে ইতিমধ্যেই যুক্ত হয়েছে খৃষ্টান জগত, পাশ্চাত্য মুসলিম বিরোধী শক্তি, আমেরিকা, ইসরাইল এবং জাতিসংঘের সম্মিলিত ষড়যন্ত্র। ফলে বোসনিয়ার মুসলমানদের জীবন এখন দুর্বিষহ। গোটা অঞ্চলের মধ্যে ভয়াবহ রক্তস্রোত। লাশ এবং লাশের গন্ধে বোসনিয়ার বাতাস পরিবেশ দূষণে আক্রান্ত। আজ যুগোস্লাভিয়ার সার্বিক গৃহযুদ্ধ বোসনিয়া-হার্জেগোভিনার মধ্যে এসে যেন সীমিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই যুদ্ধের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এখনও তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

বোসনিয়ায় সার্বিয়ার গণহত্যা

বোসনিয়া-হার্জেগোভিনা স্বাধীনতা অর্জনের পর মাস খানেক যেতে না যেতেই সার্ব হায়েনা সাবেক যুগোস্লাভ সেনাবাহিনীর সহায়তা নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে নিরাপরাধ এবং অসহায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর। তারা বৃহত্তর সার্বিয়া গঠনের অভিপ্রায়ে বোসনিয়ার উপর যে নিম্ন নিপীড়ন পরিচালনা করে যাচ্ছে তা ইতিহাসে বিরল। সার্ব খৃষ্টানদের গণহত্যা এবং সজ্জাস নাজী হিটলারের নৃশংসতা এবং মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রায় সোয়া দু'লাখ মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সার্ব বন্দি শিবিরে অত্যন্ত অমানবিক কায়দায় প্রায় অর্ধ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করে সার্ব ঘাতকরা। এখনও বন্দি শিবিরগুলোতে অনাহারে দিনযাপন করছে প্রায় লক্ষাধিক মুসলমান। উদ্বাস্তু জীবনের চরম কষাঘাতে বিপন্ন হচ্ছে প্রায় পচিশ লাখ বনি আদম। অবুঝ শিশু, অসহায় মহিলা এবং শক্তিহীন বৃদ্ধরাও নরপশু সার্বিয়দের কোনরকম সহানুভূতি পাচ্ছে না। বরং এদেরকেও বুটের তলায় পিষ্ট করে, বেয়ানোট দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে অথবা বুলেটের আঘাতে পাখির মত শিকার করে আনন্দ উল্লাস করছে সার্ব সেনা সদস্যরা। সার্বদের নির্যাতনের করুণ কাহিনী বর্ণনা করার মত ভাষা আজ নেই। ওদের নির্যাতনের পদ্ধতি এবং কৌশল কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব কিনা তা নিয়ে অনেকেই সন্দিহান। সার্বরা বন্দি শিবিরে মুসলমানদের উপর মাতাল অবস্থায় আক্রমণ চালায় এবং এলোপাতাড়িভাবে হত্যা করতে থাকে বন্দিদের। যুবকদের বেছে বেছে গলা কেটে দেয়া হয় অন্যান্য বন্দিদের সামনেই। আবার কখনো বা মুসলিম জনগণের মাথা ফাটিয়ে মগজ বের করে তা কুকুরকে খাওয়ানো হয় এবং এই দৃশ্য নিয়ে সার্ব সেনারা উল্লাসে ফেটে পড়ে। বন্দি দশায় ক্ষুধার্ত মানুষকে পাউরুটির সাথে কীটনাশক মিশিয়ে খেতে দেয় সার্বরা। ফলে সাথে সাথেই এসব মানুষের মৃত্যু হয়। মুসলমানদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বহু যুবকের উপর ক্ষুধার্ত এলসেশিয়ান কুকুর লেলিয়ে দেয়া হয় এবং যুবকদের

দেহকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। শরীরে সিরিঞ্জ দিয়ে মুসলমানদের রক্ত বের করে এনে তাদের মৃত্যু ঘটানো হয় এবং মৃতদেহকে শুকুরের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে সার্বিয়ান পশুরা।

বোসনিয়ার মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের কাহিনী যে কত বিভৎস এবং করুণ তা শুনলে গা শিউরে উঠে। তারা মুসলিম মহিলাদের এবং কিশোরীদের উপর চালায় গণধর্ষণ। মহিলা এবং অপ্ৰাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের হাত পা বেঁধে দাঁড় করিয়ে উন্মুক্তভাবে গণধর্ষণের কুকর্মও করেছে সার্ব সেনারা। তাদের বিভৎস ও বিকৃত লালসা পূরণের পর মেয়েদের গায়ে গ্যাসেলিন ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে তাদের হত্যা করা হয়। অনেকগুলো মেয়েকে এনে শুয়ে গণধর্ষণের পর একের পর এক সবাইকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। শুধু তাই নয়, গর্ভবতী মহিলারাও এদের বর্বরতা হতে মুক্তি পায়নি। গর্ভবতী মায়েদের সন্তানদের পেট কেটে অপূর্ণাঙ্গ সন্তানকে গরম পানিতে নিক্ষেপ করে হত্যা করে এবং এসব মহিলাকে কেটে টুকরো টুকরো করে হত্যা করে। পর্দানসীন মহিলারা সার্বিয়ান সেনাদের আরো বেশি হিংসার শিকার। এদেরকে উলঙ্গ করে মাঠে কাজে লাগিয়ে দেয়া হয়, ধর্ষণ করা হয় এবং এরপর নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এভাবে হত্যা এবং ধর্ষণের পরও পশু সার্বদের রক্তের পিপাসা মেটছে না। হিংসা এবং বিদ্বেষের আগুনে ওরা ক্রমেই বহুগুনে দিশেহারা হয়ে পড়ছে। এরা মুসলমান পুরুষদের লিঙ্গ কতন করে দিচ্ছে, নারীদের স্তন কেটে ফেলছে এবং জরায়ুতে এসিড ঢেলে তাকে বিকৃত করে দিচ্ছে যাতে এদের বংশ বৃদ্ধি ঘটতে না পারে।

মুসলমানদের ওপর সার্বিয়ার এসব বিকৃত নির্যাতন ছাড়াও স্বাভাবিকভাবে তারা মুসলিম এলাকাগুলোতে যখন তখন ফুর্তির ছলেও বোমা বা গোলা বর্ষণ করে থাকে। যার কোন প্রয়োজন নেই, যুক্তিও নেই। তাছাড়া মুসলিম এলাকাগুলোকে সাক্ষ্য আইনের মধ্যে রেখে দেয়া হয় দিনের পর দিন। বিদ্যুৎ লাইন বন্ধ করে দেয়া হয় যাতে কোন রকম উৎপাদন এবং বাঁচার প্রয়োজনীয় সরবরাহ তারা না পায়। পানির লাইন কেটে দেয়া হয়। সবধরনের সাপ্লাই এবং ঔষধপত্র যাতে কোন এলাকায় পৌঁছতে না পারে এবং এগুলোর অভাবে ক্রমান্বয়ে মুসলমানরা মরতে থাকে তার জন্য গোটা এলাকাকে মাসের পর মাস অবরুদ্ধ করে রাখে সার্বিয়ান সৈন্যরা। এরা তাদের হিংসা এবং বর্বরতাকে পরিপূর্ণ করার জন্য ঘরে অনেকগুলো মুসলমানকে একত্রিত করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং এভাবে তাদেরকে পুড়িয়ে জীবন্তভাবে হত্যা করে।

শুধু মানুষ হত্যার মাধ্যমে সার্বিয়ার সৈন্যরা খুশি হতে পারছে না। এরা গোটা বোসনিয়া-হার্জেগোভিনার সমস্ত মসজিদ, মাদ্রাসা ধ্বংস করে দিচ্ছে। ইসলামী বই পুস্তক এবং ধর্মীয় গ্রন্থাদির ক্ষতি সাধন করছে। বোসনিয়া আজ এক বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং জাতিসংঘ বাহিনীও আজ বোসনিয়ার পরিস্থিতি দেখে হতবাক হচ্ছে। রক্ত এবং লাশের পচা গন্ধে বোসনিয়ায় কোন ত্রাণ কাজ চালানোও আজ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বোসনিয়ার বীভৎস চিত্র গোটা দুনিয়ার মানুষকে আজ শোক বিহ্বল এবং হতচকিত করে দিয়েছে। যদিও এই বর্বরতা দমন এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর বাকি বনি আদমদের রক্ষার জন্য কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ রহস্যজনকভাবে খুব ধীরগতিতে এগিয়ে চলছে।

বোসনিয়ায় সার্বিয় আগ্রাসনের কারণ

বোসনিয়া-হার্জেগোভিনায় আজ যে ভয়াবহ সার্বিয়ান নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড চলছে তার বাহ্যিক কারণগুলো খুব একটা পরিষ্কার না হলেও এর পেছনে যে কতগুলো গভীর চেতনাবোধ কাজ করছে তা বলাই বাহুল্য। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত সাবেক যুগোস্লাভিয়ার এই প্রজাতন্ত্রটির মাটি আজ রক্তাক্ত। মানবতা সেখানে চরমভাবে বিপর্যস্ত। বোসনিয়ার এই মর্মান্তিক পরিস্থিতির বহুবিধ কারণ রয়েছে।

এক : বোসনিয়ার মুসলমানদের ধর্মীয় জাগৃতি এবং ইসলামী চেতনায় নিজেদের স্বাধীন সত্তা গড়ে তোলার প্রত্যয় তাদেরকে খৃষ্টান সার্বিয়ার নিকট অসহ্য করে তোলে। বোসনিয়ার জনগণ নিজেদেরকে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিল এবং এই লক্ষ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। যুগোস্লাভিয়ার অন্যান্য প্রজাতন্ত্রগুলোও অনুরূপভাবেই তাদের জাতি বা গোষ্ঠী পরিচিতি নিয়েই স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু বোসনিয়ার জনগণের ইসলামী চেতনায় পরিচিতি লাভ সার্বিয়ার শাসকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। কেননা তারা চেয়েছিল সার্বিয়ার নেতৃত্বে বৃহত্তর সার্বিয়ান রাষ্ট্র। বোসনিয়া তা মেনে নিতে রাজি নয়। তাছাড়া ইসলামের আলোকে কোন মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হলে তার উপর প্রভাব খাটানো সার্বিয়ার পক্ষে সম্ভব নয় তা তারা ভালভাবেই বুঝতে পারে। কোনক্রমেই ইসলামকে খৃষ্টানরা সমর্থন করা সহ্য করে নিতে পারেনি। তাই বোসনিয়ার জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিস্বাৎ করে দেয়া এবং ইসলামী চেতনাকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য সার্ব সরকার পশ্চিমা ইসলাম বিদ্বেষী দেশগুলোর সহযোগিতায় বোসনিয়ার উপর আক্রমণ চালায়। বোসনিয়ার মাটিকে নিজেদের দখলে আনা এবং ইসলামকে ধ্বংস করার মানসিকতা হতেই সার্বিয়ার এই জঘন্য হামলা। বোসনিয়ার সার্ব আক্রমণের প্রধান কারণ হলো ইসলামকে নির্মূল করা।

দুই : যুগোস্লাভিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং বর্ণের মানুষকে নিয়ে মার্শাল টিটো একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস চালান এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শে সবাইকে একাকার করে দেয়ার চেষ্টা চালান। কিন্তু তিনি তাতে সফল হতে পারেননি। সমাজতান্ত্রিক শাসনামলে সার্ব জাতিগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে সরকারী সুযোগ

সুবিধা পায় বেশি যা হতে বঞ্চিত ছিল বোসনীয়া, ক্রোশীয়া, মেন্ডিনিয়া, মন্টিনিগ্রো, স্লোভেনীয়া এবং অন্যান্য প্রজাতন্ত্র ও অঞ্চলের জনগণ। এই বঞ্চনা এবং অবহেলা হতে জন্ম নেয় জাতিগত বিরোধ। বিশেষ করে সার্বিয়ানদের প্রতি সকলের একটা ক্ষোভ ছিল। তাই যুগোস্লাভ ভেঙ্গে গেলে সবাই আলাদাভাবে স্বাধীন হয়ে যায়। বোসনিয়া ও সার্বিয়ার এই মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বও আজকের বিরোধের একটিকারণ।

তিন : ওসমানীয় শাসনামলে সার্বসহ অন্যান্য জাতিগুলো ছিল মুসলমানদের অধীন। তখন তারা অত্যাচারী বিভিন্ন ওসমানীয় শাসক দ্বারা বঞ্চিত হয়েছিল। মুসলমানরাও সেইসব শাসকদের অত্যাচার এবং শোষণের হাত হতে রেহাই পায়নি। অতীতের এই স্মৃতি সার্বীয়রা আজও বহন করে যাচ্ছে। সার্বরা তাই নিজেদেরকে নির্যাতিত জাতি বলে মনে করে। তাদের মনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি ক্ষোভ জেগে আছে এবং এই ক্ষোভ খুবই সুপরিকল্পিতভাবে এদের মনে জাগিয়ে রেখেছে সাম্প্রদায়িক এবং উগ্র খৃষ্টানরা। যদিও কোন মুসলমান শাসকই যুদ্ধ ব্যতীত কোন সার্বকে অত্যাচার করেনি, খুন করেনি। অথচ আজ সার্বরা মুসলমানদের বিনা কারণেই জবাই করছে প্রতিনিয়ত।

চার : কমিউনিজমের ব্যর্থতার পর যুগোস্লাভ প্রজাতন্ত্রগুলো ভেঙে গেলে তারা সবাই স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এগুলো বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করলেও কোন আদর্শিক রাষ্ট্র হিসেবে কোনটাই গড়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু বোসনিয়া হার্জেগোভিনা রাষ্ট্রটি ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে এগিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা চালায়। এটা আদর্শহীন অন্যান্য সাবেক যুগোস্লাভ প্রজাতন্ত্রগুলোর নিকট বিশেষ করে সার্বিয়ার নিকট অসহ্য বলে মনে হয়। তাই সার্বরা বোসনিয়ার ইসলামী জনতাকে ধ্বংস করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং হত্যা, ধ্বংস ও নির্যাতনের বিভিন্নীকা সৃষ্টি করে বোসনিয়া হার্জেগোভিনায়।

বোসনিয়ায় আজ যে সার্বক্ষণিক মুসলিম নিপীড়ন, হত্যা, ধর্ষণ এবং সম্পদের বিনাশ চলছে তার জন্য সার্বিয়ান সরকার নিয়োজিত করেছে তার সকল সামরিক এবং রাজনৈতিক শক্তি। তাদের সামনে রয়েছে বহুবিধ উদ্দেশ্য :

এক : বিশ্বের জনগণ সিদ্ধান্ত নেবার আগেই বোসনিয়া হার্জেগোভিনার মাটিকে ক্ষত বিক্ষত করা যাতে সেখানে কোন ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত হতে না পারে।

দুই : বোসনিয়ার জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত এবং আতঙ্কিত করে তোলা যাতে করে আলাদাভাবে বসবাস করার প্রত্যাশা তারা পরিহার করে। এ জন্য সার্ব সেনারা চালাচ্ছে হত্যাকাণ্ড। সার্বদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে ইতিমধ্যে সোয়া দু'লক্ষাধিক মুসলমান মৃত্যুবরণ করেছে। প্রায় ৫০ হাজার মহিলা এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালিকাকে নির্যাতিত করা হয়েছে। ২৫ লক্ষ মুসলমান হয়েছে উদাস্তু। বিভিন্ন বন্দী শিবিরে কিংবা ঘরবাড়িতে আহত হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে আরো লক্ষাধিক মানুষ।

তিন : বোসনিয়ার মুসলমানরা যাতে আর কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে এবং আলাদা থাকুক বা সার্বিয়ার অংশ হয়ে থাকুক কোন ক্ষেত্রেই যেন সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিকভাবে বলিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারে তার জন্যই আজ এই ধ্বংসলীলা ও নিধনযজ্ঞ চালানো হচ্ছে।

চার : বোসনিয়ার মুসলমানদের রক্ষা এবং মানবিক সাহায্যের নামে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খৃষ্টান সংস্থা যাতে বোসনিয়ায় আসতে পারে তাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে রয়েছে বোসনিয়ায় সার্বীয় হামলা চালাবার নেপথ্যে। কেননা এইসব সাহায্য সংস্থাগুলোর খৃষ্টানরাও বোসনিয়ার মুসলমানদেরকে খতম করার কাজে লাগবে এবং এতে বিশ্ব সম্প্রদায়কেও ফাঁকি দিয়ে তাদের আসল লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

পাঁচ : বোসনিয়ার মুসলমানদেরকে নিঃশেষ করার পেছনে সার্বীয় এবং ইউরোপীয় ও আমেরিকার খৃষ্টানদের আরো একটি সুদূর প্রসারী লক্ষ্য রয়েছে। আর তা হলো গোটা বিশ্বের ইসলামী পুনর্জাগরণকে হুমকির মধ্যে নিপতিত করা। বোসনিয়ার পরিণতি দেখে আর কোন দেশ বা রাষ্ট্রের জনগণ যাতে আফগানিস্তান এবং ইরানের মত ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস না পায় তাকে প্রতিহত করার একটি গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে বোসনিয়ার হামলার পেছনে। সম্প্রতি ডগলাস গেহের নিকট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের চিঠিতে বোসনিয়ার ব্যাপারে খৃষ্টানদের উদ্দেশ্য ও প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

ছয় : বোসনিয়ায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে সেখানকার ৩১% সার্ব জনগণ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীতে পরিণত হবে এবং তাদেরকে ইসলামী সরকারের অধীনে বসবাস করতে হবে যা সার্বিয়ানরা কোনক্রমেই মেনে নিতে রাজি নয়। তাই সার্বরা বোসনিয়ার মুসলমানদের অস্তিত্বকেই মুছে ফেলতে উদ্যত।

বোসনিয়ায় মুসলিম হত্যায় বৃটেনের ভূমিকা

বলকান উপদ্বীপে স্থিতিশীলতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বৃটেনের ভূমিকা খুবই ন্যাঙ্কারজনক। বোসনিয়ায় যুদ্ধ বন্ধ না হয়ে তা বরং আরো দীর্ঘায়িত হোক এটাই গ্রেট বৃটেনের মনোভাব। এ ব্যাপারে বৃটেনের লক্ষ্য হলো তিনটি :

এক : বলকান এলাকায় শান্তি অত্র এলাকায় জার্মানীর শক্তিকে বৃদ্ধি করবে এবং এতে বন-প্যারিস সম্পর্ক জোরদার হবে যা কোনক্রমেই হতে দেয়া যাবে না।

দুই : ইউরোপে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্বই বৃটেন মেনে নিতে নারাজ।

তিন : বোসনিয়ার মুসলমানদের স্তব্ধ করে দিয়ে গোটা বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনগুলোকে বুঝিয়ে দেয়া যে, পশ্চিমা রা কোনক্রমেই আর কোন ইরান বা আফগানিস্তান মেনে নেবে না।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বোসনিয়ার মুসলমানদের ব্যাপারে পাশ্চাত্যের সামরিক পদক্ষেপের ঘোর বিরোধিতা করেছে বৃটেন। বৃটেন ইউরোপীয় গোষ্ঠীকে সার্বিয়ার পক্ষে এবং বোসনিয়ার বিরুদ্ধে সব সময়ই ব্যবহার করেছে। '৯২ এর শেষ দিকে স্কটল্যান্ডের এডেনরায় অনুষ্ঠিত ইসি পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা বলেছিলেন, “সার্বিয় কসাইরা বোসনিয়ার জনগোষ্ঠীকে ধ্বংসের নেশায় মত্ত। অথচ এখন বৃটেনই সার্বদের অস্ত্র সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে যাতে কসাইরা আরো বেশি মুসলমান হত্যা করতে পারে, ২১ ও ২২শে জুন কোপেন হেগেনে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বোসনিয় মুসলমানদের রক্ষার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তই হয়নি বৃটেনের বিরোধিতার কারণে। বৃটেন আজ যে নীতি এবং কৌশল বোসনিয়ার ব্যাপারে গ্রহণ করেছে তার নেতা হচ্ছে খৃষ্টান ও মুসলিম বিদ্বেষী প্রধানমন্ত্রী জন মেজর। জন মেজরের ঘৃণ্যতম এবং পৈশাচিক মনোভাবের পরিচয় মেলে তার পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ডগলাস হেগকে লেখা তার চিঠির বিষয় বস্তুর দিকে লক্ষ্য করলে। তিনি বলেন,

“বোসনিয়া হার্জেগোভিনার মুসলমান জনগণকে অস্ত্র এবং সামরিক প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদানে আমরা বর্তমানে রাজী নই এবং ভবিষ্যতেও তা করতে দেয়া হবে না। আমরা এই এলাকাটির উপর চাপানো জাতিসংঘ অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ও কার্যকরী রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখব।” জন মেজর তার বিকৃত মনোভাবকে ব্যক্ত করে আরো বলেছেন, “ইউরোপে একটি ইসলামী রাষ্ট্র সহ্য করা যায় না। আমরা এটিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখব।”

একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, বৃটেন বোসনিয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এবং মুসলমানদের নিঃশেষ করার জন্য ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু বোসনিয়াই নয়, গোটা বিশ্বের মুসলমানদের স্বার্থ নস্যাৎ করার জন্য বৃটেন তার সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছে ইতিমধ্যেই।

বৃটেন মুসলমানদের নিঃশেষ করার জন্য যে বন্ধপরিকর তার প্রমাণ হচ্ছে সার্বিয়াকে অস্ত্র দান এবং বোসনিয়ার উপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখার জন্য জাতিসংঘের উপর চাপ সৃষ্টি। নিরাপত্তা পরিষদে যত বারই বোসনিয়া প্রসঙ্গ উঠেছে বৃটেন ততবারই মুসলমানদের বিরুদ্ধে কথা বলেছে। বৃটেনের সামরিক হস্তক্ষেপকে সার্বিয়ার পক্ষে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রেও বৃটেন সরাসরি কাজ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বোসনিয়ার ব্যাপারে গোটা ইউরোপকে অকার্যকর রাখা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়গুলোকে বাধার সৃষ্টিতে বৃটেনের বর্তমান সরকার প্রধান ভূমিকা পালন করছেন। বৃটেনের এই জঘন্য আচরণ সভ্যতার সচেতন ও বিবেকবান মানুষের মনে তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণার জন্ম দিয়েছে।

জন মেজরের মুসলিম নিধনের নীলনক্সা

(জন মেজর তার একজন প্রতিমন্ত্রীকে একটি চিঠি লিখেছেন। এই চিঠিটি মুসলিম বিশ্বের জনগণের জন্য একটা কঠিন হুঁশিয়ারী। এতে মুসলমানদের নিঃশেষ করা এবং তাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষমতা খর্ব করার পশ্চিমা পরিকল্পনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। চিঠিটি হুবহু প্রকাশিত হয় হংকং মুসলিম হেরাল্ড '৯৩-এর জুন সংখ্যায়। নীচে ইংরেজীতে এবং বাংলায় তার অনুবাদ তুলে ধরা হলো।)

Dear Douglas,

Thank you for your indepth report on the current as well as past situation in the "Bosnia-Hercegovina" region of the former Yugoslavia.

As you are well aware from previous discussions, both within the "Cabinet" and at other times Her Majesty's Government has not changed its position on any on any of the following policies.

1) We do not agree now or in the future to "arm or train" the Muslims within Bosnia-Hercegovina with military hardware.

2) We will continue to help impose & enforce the U. N. embargo on weapons to this region, While we are well aware that Greece, Russia & Bulgaria are supplying arms & training to Serbia & Germany, Austria, Slovinia & even the Vatican are doing similar effort on behalf of the Croation & H. V. O. forces within the region, it is of paramount importance that we make sure that no such efforts are successful on behalf of the Muslims within the region from Islamic States & Groups.

To this end & until the final outcome of the situation on the ground i. e. the dismemberment of Bosnia-Hercegovina & its destruction as a possible "Islamic

State" within Europe which will not be tolerated, we will continue to follow this policy. Further, the mistake of training & arming the Afgan fighters against the forces of the former USSR & their becoming so-called "Islamic fighters" now in other parts of the world, as in Bosnia-Herzegovina. This could lead to serious problems in the future within the emigre Muslim population with & North America, Please see attached paper from the United States entitled; "Iran's European springboard?" Dated September 1, 1992 within reason these criteria are becoming more & more relevant, therefore, special attention by our internal security services should be placed on the Muslim Communities within the Western States, especially here in the U. K.

3) Until the situation in the former Yugoslavia is settled we must at all cost make sure that no state that can be deemed "Muslim" is allowed any say on the West's policy actions in this area, especially that of Turkey. It is therefore, necessary to continue with the sham of the "Vance-Owen" peace talks in order to delay any such possible actions until Bosnia-Herzegovina no longer exists as a viable state is totally displaced from its land.

Whilst this may seem a hard policy I must insist with you and the policy makers within the F. C. O., & the Armed Service that this is in fact "real-politic" and in the best interest of a stable Europe in the future, whose value system is and must remain based on a "Christian-Civilisation" & ethic. This view I must inform you is also felt in every other European and North American government, therefore, we will not intervene in this region to save the muslim population or push to lift the arms embargo on them. The Muslims in the West must be made to see that they can not oppose our view of the world in the "New World Order" & that by the inaction of

the "so-called" Muslim government of the world, in doing nothing to oppose the destruction of the muslims of Bosnia-Hercegovina & not following through on their pledges to do something at the OIC Conference, If the West do not rescue the Muslims, they are totally powerless to oppose us as we control their governments.

Whilst I know you do not feel fully as I or the Minister of defence feel on this subject, it is important that we all show a united front to those in Parliament and the country on this matter, especially after the "forceful" attack on this policy by the former prime Minister.

I expect all those that serve this government to obey "Cabinet Responsibility."

Yours Sincerely
John M. (Signed)
(John Major)

প্রিয় ডগলাস

সাবেক যুগোস্লাভিয়ার বোসনিয়া হার্জেগোভিনা অঞ্চলটির অতীত এবং বর্তমান অবস্থার বিশদ বিবরণের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কেবিনেট এবং মহামান্য সরকারের মধ্যে বিভিন্ন সময়ের আলোচনা সম্পর্কে আপনি যেরূপ অবগত রয়েছেন যেসব ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কৌশলের কোন পরিবর্তন হয়নি।

(এক) বোসনিয়া হার্জেগোভিনার মুসলমান জনগণের অস্ত্র অথবা প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ প্রদানে আমরা এখন যেমন সম্মত নই ভবিষ্যতেও তেমনি রাজি হব না।

(দুই) আমরা এই অঞ্চলের উপর চাপানো জাতিসংঘের অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা বলবৎ এবং কার্যকর রাখার ব্যাপারে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব। আমরা জানি, গ্রীস, রাশিয়া এবং বুলগেরিয়া সার্বদের অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, স্লোভানিয়া এবং ভেটিকানও অত্র এলাকার ক্রোট এবং সার্ব সেনাদের অনুরূপ সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় কোন মুসলিম দেশ কিংবা সংস্থার নিকট হতে যাতে এরূপ কোন সহযোগিতা প্রয়াস মুসলমানদের জন্য সফল না হয় তা নিশ্চিত করা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বোসনিয়া হার্জেগোভিনার সরকার এবং তার মুসলমানরা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের এই নীতি অনুসরণ করব, কেননা ইউরোপের বুকে কোন ইসলামী রাষ্ট্রকে সহ্য করা হবে না। অধিকন্তু সাবেক রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান যোদ্ধাদের অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে আমরা যে ভুল করেছি বিশ্বের অপর কোন স্থান যেমন বোসনিয়া হার্জেগোভিনার ব্যাপারে একই ভুল হতে দিতে পারি না। এতে ভবিষ্যতে ইউরোপিয় গোষ্ঠী এবং মুসলমানদের ব্যাপারে এখানে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হবে। এতদসঙ্গে সংযুক্ত 'ইরানের ইউরোপিয়ান শিপ্রংবোট' নামকরণের ব্যাপারটি দেখুন যার তারিখ হচ্ছে পহেলা সেপ্টেম্বর '৯২ইং। বাস্তবিক কারণেই এইসব বৈশিষ্ট্যগুলো খুব বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। অতএব, আমাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সার্ভিসের বিশেষ নজর দিতে হবে, পশ্চিমা দেশগুলোর মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর বিশেষ করে যুক্তরাজ্যের প্রতি।

(তিন) সাবেক যুগোস্লাভিয়ার পরিস্থিতির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আমাদের যে কোন মূল্যে নিশ্চিত করতে হবে যে, পশ্চিমা নীতি বা কৌশলের উপর প্রভাব বা ভূমিকা খাটাতে পারে এমন কোন মুসলিম দেশ থাকবে না এবং বিশেষ করে তুরস্ক। অতএব এর জন্য ভ্যান্স-ওয়েন 'প্রতারণার' শান্তি আলোচনা ততদিন পর্যন্ত চালু রাখা দরকার যতদিন না বোসনিয়া হার্জেগোভিনা একটি রাষ্ট্ররূপে টিকে থাকার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে এবং এর মুসলমান জনশক্তি সম্পূর্ণভাবে নিজ দেশ হতে বিতাড়িত হয়।

যদিও এই নীতি খুবই কঠোর বলে মনে হচ্ছে, তথাপি আপনাকে, এফসিও এবং সেনা সার্ভিসের সাথে যারা পলিসি তৈরী করে তাদের জোর দিয়েই বলতে পারি, এটাই হচ্ছে 'বাস্তব রাজনীতি' এবং স্থিতিশীল ইউরোপের ভবিষ্যতের স্বার্থেই তা করতে হবে যে ইউরোপ খৃষ্টীয় সভ্যতা এবং নীতি শাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল। আপনার জানার জন্য বলছি যে, অন্যান্য ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকান সরকারগুলোর প্রত্যেকেরই উপরের ধারণাটি বিদ্যমান। অতএব, আমরা এই অবস্থায় মুসলমান জনসংখ্যা টিকিয়ে রাখার জন্য হস্তক্ষেপ করব না অথবা তাদের উপর হতে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার জন্য মধ্যস্থতা করব না। পাশ্চাত্যে বসবাসরত মুসলমানদেরকে বুঝতে হবে যে, নতুন বিশ্ব পরিকল্পনায় আমরা যে বিশ্বাস স্থাপন করছি তার বিরোধিতায় তারা অসহায় এবং বিশ্বের তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলো তাদের নিশ্চয়তার মাধ্যমে বোসনিয়া

হার্জেগোভিনার মুসলমানদের ধ্বংস ঠেকানো ওআইসি সম্মেলনে কিছু করার যে সংকল্প ব্যক্ত করেছে তার বাস্তবায়ন সম্ভব নয় যদি না পশ্চিমা দেশগুলো মুসলমানদের রক্ষা করে। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, তারা আমাদের বিরোধিতা করতে পারে না। কেননা আমরাই তাদের সরকারগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকি।

আমি অবগত আছি যে, আমি অথবা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এ বিষয়ে যতটা অনুভব করি তার সাথে আপনার অনুভূতি বা ধারণা এক নয়। তবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, পার্লামেন্ট এবং দেশের মধ্যে এ বিষয়ে আমাদের সকলেই এক হয়ে কাজ করব। বিশেষ করে এই নীতির উপর সাবেক প্রধানমন্ত্রীর “জোর” আক্রমণের পরবর্তী সময়ের জন্য আমাদের এটা করা প্রয়োজন।

এই সরকারে কর্তব্যরত সকল ব্যক্তিই কেবিনেটের দায়িত্ব মেনে চলবেন এটা আমি আশা করি।

আপনার বিশ্বস্ত

জন মেজর

বোসনিয়ার হত্যাযজ্ঞে ফ্রান্সের ভূমিকা

১০ শতাংশ ক্যাথলিক এবং ২ শতাংশ প্রটেস্ট্যান্ট খৃষ্টানদের দেশ ফ্রান্স বোসনিয়ার ব্যাপারে গ্রেট ব্রিটেন বা রাশিয়ার মত অতটা বিদ্বেষী না হলেও ফ্রান্সের রয়েছে প্রচণ্ড মুসলিম বিদ্বেষ। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সোয়া মিতেরার কর্মতৎপরতা এবং কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি খুবই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে যে ফ্রান্স বলকান এলাকায় শান্তির প্রয়াসী হলেও ব্যবস্থা নিতে নারাজ। তবে মিতেরাই একমাত্র রাষ্ট্র প্রধান যিনি সার্বদের গোলাবর্ষণ এবং ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের মধ্যেও সারিয়েভো সফরের ঝুঁকি নেন। তিনি বোসনিয়ার মুসলমানদের উপর হতে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ারও আহবান জানান। প্রথমদিকে তিনি বলকান সংকট সমাধানে ইউরোপীয় প্রয়াসকে জোরদার করার প্রয়াস চালান। কিন্তু ইউরোপের অপরাপর দেশের প্রচণ্ড বিরোধীতা এবং তৎপরতার কারণে মিতেরা তার মিশনে তেমন কোন সফলতা অর্জনে সক্ষম হননি। মিতেরা সার্বদের উপর সামরিক অভিযান চালানোর জন্যও ন্যাটো এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশকে আহবান জানান। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশগুলোর বিরোধীতার মুখে মিতেরার প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মিতেরার এই ইতিবাচক প্রয়াসকে অনেকে সমর্থন করলেও বোসনিয়ার মুসলমানরা ফ্রান্সের ভূমিকাকে সন্দেহের চোখেই দেখে। তার কারণ প্রথম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্স সার্বদের মিত্র হিসেবে কাজ করে। এ কারণে বোসনিয়ার মুসলমানগণ মনে করে বলকান অঞ্চলে ফরাসী বাহিনী সার্বদের পক্ষেই কাজ করে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, বোসনিয়ার মুসলমানদের ধারণাই বাস্তব। জাতিসংঘ বাহিনীতে যোগদানকারী ফ্রান্সের খৃষ্টান সেনারা বোসনিয়ার মুসলমানদেরকে হত্যার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ওদিকে ফ্রান্সকে বোসনিয়ার সংকট উত্তরণের জন্য প্রচেষ্টা চালানাকারী দেশ মনে করা হলেও তারা অবশেষে বোসনিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে। মিতেরা এক সময় বোসনিয়ার উপর হতে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার আহবান জানালেও নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের তিনি বিরোধীতা করে মুসলমানদের সন্দেহকে ঘনীভূত করে তুলেন। ১৯৯৩ সনের ২৯শে জুন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ক্যাপ ভার্ডে মরক্কো, পাকিস্তান,

ভেনিজুয়েলা এবং জিবুতি বোসনিয়ার উপর হতে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার প্রস্তাব তুললে ফ্রান্সও এর বিরোধীতা করে। ফলে ফ্রান্স সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণা অস্পষ্ট হয়ে যায়। ফ্রান্সের এই দ্বিমুখী নীতি সার্বিয়ার মুসলিম হত্যার নেশাকে আরো ত্বরান্বিত করেছে বৈকি! ওদিকে জন মেজরের বক্তব্য হতে বুঝা যাচ্ছে ফ্রান্স সার্বদের অস্ত্র সাহায্য দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ফ্রান্স মূলতঃ মুসলিম স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে। তাই রাজনৈতিক স্বার্থে বোসনিয়ার ব্যাপারে তাদের বক্তব্য বলিষ্ঠ না হলেও ফ্রান্স বোসনিয়ার স্বাধীনতার ঘোর বিরোধী।

সার্বিয় গণহত্যায় রাশিয়ার সমর্থন

সমাজতন্ত্রের দোহাই দিয়ে বিগত ৭০ বছর মুসলমানদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নির্মমভাবে হত্যা করেছে রাশিয়া। ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে ধ্বংস করেও ক্ষান্ত হয়নি রুশ সমাজতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠী। তারা মুসলিম দেশগুলোতে ধর্মীয় ব্যাপারেও নানাভাবে হস্তক্ষেপ করেছিল সমাজতান্ত্রিক শাসনামলে। আজ সমাজতন্ত্রের পতন হলেও রাশিয়ার ইসলাম বিরোধী মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি। বোসনিয়া সংকটে রাশিয়া সার্বদের ঘোর সমর্থক। সেখানে সমরাস্ত্র হতে শুরু করে রসদ পর্যন্ত সব ধরনের সাহায্য যুগিয়ে যাচ্ছে রাশিয়া। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে রাশিয়া সব সময়ই বিরোধিতা করে আসছে। ৯৩ সালের ২৯শে জুন নিরাপত্তা পরিষদে বোসনিয়ার উপর হতে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র ভোট দিলেও ফ্রান্স এবং বৃটেনের সাথে রাশিয়াও এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট প্রদান করে। শুধু বোসনিয়ার ব্যাপারেই নয়, অন্যান্য মুসলিম এলাকার ইসলামী চেতনার বিপক্ষেও রাশিয়া এখন সক্রিয়। আফগানিস্তান হতে হাত গুটাতে বাধ্য হলেও সম্প্রতি আফগান গ্রামে তার বর্বরোচিত হামলা রাশিয়ার ইসলাম বিদ্বেষী নগ্নতাকে আরো স্পষ্ট করে দিয়েছে। মুসলিম প্রধান আজারবাইজানের স্বাধীনতা নস্যাৎ এবং ইসলামী জাগরণকে ধ্বংস করার জন্য রাশিয়া আর্মেনীয় খৃষ্টানদেরকে লেলিয়ে দিয়েছে মুসলমানদের উপর। মধ্য এশিয়ার অন্যান্য স্থানেও ইসলাম এবং মুসলমানদের ঠেকানোর জন্য এখন যাবতীয় তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে রাশিয়া। তবে বোসনিয়ার ব্যাপারে রুশ শাসকদের ভূমিকা খুবই ন্যাঙ্কারজনক এবং বীভৎস। ৯৩ সালের ৯ই আগস্ট ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত ন্যাটো সদস্য দেশগুলো সার্ব অবস্থানগুলোর উপর বিমান আক্রমণ শুরু করার প্রস্তাব অনুমোদন করলে তার জোর বিরোধিতা জানায় রাশিয়া। শুধু তাই নয়, রুশ শাসকরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কড়া ইশিয়ারীও উচ্চারণ করে। রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে কোজিরভ ১১ই আগস্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই ইশিয়ারী উচ্চারণ করেন। এ ব্যাপারে ন্যাটোকে সম্ভাব্য বিমান হামলা হতে বিরত রাখার জন্য রাশিয়া উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থার (ন্যাটো) সদস্য দেশগুলোর মধ্যে কূটনৈতিক তৎপরতাও

তৎপরতাও চালায়। রাশিয়া কোনক্রমেই তার সাবেক মিত্র সার্বিয়ার বিপক্ষে যেতে রাজী নয়। রাশিয়া সার্বিয়ার গণহত্যাকেও মোটেই অন্যায় বলে মনে করছে না। এ ব্যাপারে রাশিয়ার চরিত্রের সাথে সার্বিয়ার মিল খুব লক্ষণীয়। কেননা রুশরা দুনিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যত লোক হত্যা করেছিল তার তুলনায় সার্বিয়ার মুসলিম হত্যাকে তারা অস্বাভাবিক কিছুই ভাবতে পারছে না। সম্প্রতি বোসনিয়ার উপর হতে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার জন্য আমেরিকা প্রস্তাব দিলে রাশিয়া এর প্রচণ্ড বিরোধিতা করে। রাশিয়া জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একটি খসড়া প্রস্তাবের উপর গত ২ ডিসেম্বর রাতে ভেটো প্রয়োগ করেছে। বসনিয়ার মুসলিম প্রধান সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যবহারের জন্য বিদ্রোহী সার্বদের অধিকৃত ক্রোয়েশিয়ার অংশে সার্বিয়া থেকে জ্বালানি তেল সরবরাহ বন্ধের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রাশিয়া এই ভেটো দিয়েছে। রাশিয়া বলেছে প্রস্তাবটি অনুমোদিত হলে তাদের সনাতন মিত্র সার্বিয়ার ক্ষতি হতে পারে। রয়টার, এএফপি ও বিবিসি জানায়, ১৫ জাতির নিরাপত্তা পরিষদে ১৩-১ ভোট প্রস্তাবটি নাকচ হয়।

নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো ক্ষমতার অধিকারী ৫ জাতির অন্যতম সদস্য চীন ভোটদানে বিরত থাকে। সাংবাদিকরা বলেছেন, পঞ্চ দেশীয় কন্ট্রাক্ট গ্রুপ সার্বিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার জন্য বসনিয় সার্বদের অনুমতি দান এবং বসনিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে সার্বদের স্বীকার করে নেয়ার আহবান সম্বলিত একটি নয়া শান্তি পরিকল্পনা পুনঃবিবেচনা করে উহাতে যখন একমত হতে যাচ্ছিলেন তখনই এই ভেটো দেয়া হলো। সার্বরা এই ভেটোকে খুবই ঠাণ্ডা মনোভাবের সঙ্গে নেয়।

বোসনিয়ার ক্ষেত্রে আমেরিকার হতাশাজনক নীতি

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের অস্তিত্ব বিলোপ এবং ওয়ারশ জোটের পতনের পর বিশ্ব নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে গত দশকের শেষ প্রান্তে। ফলে পৃথিবীর একক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আমেরিকার কৌশল, শক্তি এবং সামর্থ্যের সাথে চ্যালেঞ্জ করার মত কোন দেশ আজ বর্তমান না থাকায় আমেরিকার আধিপত্য এবং নিয়ন্ত্রণ এখন বিশ্বজুড়ে। ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার প্রতিটি দেশই বর্তমানে পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আজ্ঞাবাহী। সত্যি কথা বলতে কি, মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোও আমেরিকার উপর নানাভাবে নির্ভরশীল। অথচ যুক্তরাষ্ট্র কোনদিনই মুসলমানদের বন্ধু ছিল না, আজও নেই। বরং দেশে দেশে ইসলামকে ধ্বংস এবং মুসলমানদের স্বার্থ বিপন্ন করার ক্ষেত্রে রাশিয়া, বৃটেন ও ফ্রান্স যেরূপ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে আমেরিকাও একই আচরণ করছে মুসলমানদের প্রতি। ফিলিস্তিন সমস্যার সৃষ্টি, সেখানে মুসলিম নিধন, জন্মভূমি হতে প্যালেস্টাইনী জনগণকে বিতাড়ন, ইসরাইলকে লালন এবং শক্তিশালী করে গড়ে তুলে মধ্যপ্রাচ্যকে অশান্ত করার ক্ষেত্রে আমেরিকাই একমাত্র দায়ী। ইরানের ইসলামী সরকারকে নস্যাৎ, আফগানিস্তানের ইসলামী রাষ্ট্রকে বিনষ্ট করা, পাকিস্তান, সুদান, বাংলাদেশ এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে ইসলামী জাগরণকে ধাবিয়ে রাখার ব্যাপারে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ সদাই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর প্রতিটি মুসলিম দেশ যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারে এবং যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে থাকতে হয় তার জন্য আমেরিকা বরাবরই সচেষ্ট। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে তার সামরিক ও রাজনৈতিক পাহারাদারী ও মোড়লী এরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি দেশই এখন মার্কিন সামরিক সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। তাদের নিকট শক্তি বলতে কোন কিছুই আজ বর্তমান নেই।

মুসলমানদের দাবিয়ে রাখার জন্য আমেরিকার এ গভীর ষড়যন্ত্র বহু দিনের। এদিকে ইরাকের শক্তিকে খর্ব করার জন্য আমেরিকা বিনা অজুহাতে সেখানে যে সামরিক এবং কূটনৈতিক সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে তা আজ আর কারোরই অজানা নেই। বোসনিয়ায় মুসলিম গণহত্যার ব্যাপারে আমেরিকা সরাসরি জড়িত না হলেও তার দ্বৈত ভূমিকা এবং নমনীয়তা মুসলিম গণহত্যাকে উৎসাহিত করেছে বৈকি!

ইউরোপের বুকে একটি আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ইউরোপীয় গোষ্ঠী যেমন চায় না, আমেরিকাও তা কামনা করে না। কেননা মার্কিন খৃষ্টান প্রশাসন বা ইহুদীদের প্রতিনিধি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনও বোসনিয়ায় মুসলিম হত্যার একজন সমর্থক—একথার প্রমাণ মেলে ক্লিনটনের নীতি এবং কৌশলের মাধ্যমে। আমেরিকা বলছে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে ইউরোপীয় গোষ্ঠী রাজী না হওয়ায় তারা কোন পদক্ষেপ নিতে পারছে না। ওয়াশিংটনের এই যুক্তি একটি প্রতারণা মাত্র। তার কারণ ইরাকে বোমা হামলা কিংবা পানামায় নরিয়েগার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে মিত্রদের সাথে কোন কথা বলার প্রয়োজন হয় না অথচ বোসনিয়ার মুসলমানদেরকে মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করার ব্যাপারে ইউরোপের দুয়ারে দুয়ারে তাকে অনুমতি শিক্ষা করতে হয়। এটা একটা হাস্যকর বিষয় ছাড়া কিছুই নয়। অথচ আমেরিকা শুধু ইচ্ছা করলেই সার্বিয়ার বর্বরতাকে ধাবিয়ে দিতে পারে। একজন পশ্চিমা কূটনীতিক বলেছেন, “ভূমধ্য সাগরের আদ্রিয়াটিক উপকূলে দাঁড়িয়ে আছে মার্কিন এয়ার ক্রাফট সারগোট। তা ব্যবহারে সার্বিয়ার যে কোন শক্তিকেই গুড়িয়ে দেয়া যায়। অথচ আমেরিকা তা না করে শুধু বিলম্বের নীতি অবলম্বন করে যাচ্ছে যা একটি জনগোষ্ঠীকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে ক্রমান্বয়ে।” একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, আমেরিকা আজ এমন এক শক্তি যার যে কোন সিদ্ধান্ত ইউরোপ সহজেই মেনে নিতে বাধ্য। কিন্তু মুসলমানদের স্বার্থের পক্ষে আমেরিকা কোন সময়ই এই সুযোগ ব্যবহার করছে না। আমেরিকার এই ভূমিকাকে নিন্দা করেছেন কার্টার প্রশাসনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রাজেনিসকি। তিনি বলেন, “আমি খোলাখুলিভাবে বলতে চাই যে, সারায়েভোর যখন পতন ঘটছে তখন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ওয়ারেন ক্রিস্টোফার তার দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন যা লজ্জাজনক এবং আমেরিকার জন্য রাজনৈতিক বিপর্যয়। এর মাধ্যমে ইউরোপ এবং আমেরিকার নেতৃত্বের পরাজয় ঘটেছে। একজন আমেরিকান হিসেবে আমি এতে বিরত।” আমেরিকার দ্বৈতনীতি এবং অপেক্ষার নীতিকে অনেক আমেরিকানই ঘৃণা করেছেন। কংগ্রেসের ৭৮ জন সদস্য বোসনিয়ায় সার্বিয়ার হামলা বন্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগের জন্য ক্লিনটনকে চাপ দিয়েছেন। ইউরোপীয় নিরাপত্তা এবং সহযোগিতা সংক্রান্ত কমিশনের কো-চেয়ারম্যান সিনেটর ভেনিস ডিকনসিনিও একই আহবান জানান। তিনি আমেরিকার বিলম্বের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। কিন্তু বিল ক্লিনটন এ ব্যাপারে খুব একটা অগ্রসর হচ্ছেন না। এর ফলে সার্বিয়রা মুসলিম হত্যার ব্যাপারে আরো বেশী

সক্রিয় হচ্ছে এবং গোটা বোসনিয়ায় তাদের শক্তিকে দাপটের সাথে ব্যবহার করে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে বোসনিয়ার ব্যাপারে খুবই ন্যাঙ্কারজনক এবং অবিবেচক নীতি গ্রহণ করে যাচ্ছে তার প্রমাণ মেলে এই নীতির প্রতিবাদে তারই প্রশাসনের দু'জন বিশিষ্ট কর্মকর্তার পদত্যাগের মাধ্যমে। বোসনিয়ায় মার্কিন নীতির প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে ক্লিনটন প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মিঃ হারিস এবং পররাষ্ট্র দফতরের কর্মকর্তা জন ওয়েনটার্ন ৯৩ সালে সম্প্রতি পদত্যাগ করেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছেঃ “বোসনিয়া হার্জেগোভিনায় সার্ব আগ্রাসনে সমর্থন দেবার মার্কিন নীতি এরা মেনে নিতে পারেন না।” বাস্তবিকপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যথাযথ ভূমিকা বোসনিয়ার রক্তপাতকে অনেক আগেই বন্ধ করতে পারত।

বোসনিয়ার ব্যাপারে আমেরিকার এই ভূমিকার পেছনে কতগুলো কারণ নিহিত রয়েছে। এগুলো হচ্ছেঃ

একঃ ইউরোপের বুকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে উঠুক তা একটি খৃষ্টান প্রভাবিত দেশ হিসেবে আমেরিকার কাম্য নয়। কেননা, গোটা বিশ্বে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করার নীতি আমেরিকা বরাবরই গ্রহণ করে যাচ্ছে।

দুইঃ সার্বরা পরাজিত হলে বলকান অঞ্চলে জার্মানীর শক্তি বৃদ্ধি পাবে বলে যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা। রাজনৈতিক কারণে আমেরিকা পুনর্গঠিত জার্মানের বিকাশে এমনতেই আতঙ্কিত। তাছাড়া জার্মানী বোসনিয়া শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়ার কারণে বোসনিয়ার প্রতি জার্মানীর যে একটা আগ্রহ রয়েছে তা আমেরিকা বুঝতে পারছে বলেই মনে হয়। তাই যুক্তরাষ্ট্র চাচ্ছে সার্বরাই এখানে বিজয়ী হোক।

তিনঃ ইউরোপীয় জোট এবং ন্যাটোর সদস্যরা বোসনিয়ার ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়ার ঘোর বিরোধী। যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্রদের সাথে কোন দ্বন্দ্ব না জড়ানোর জন্যই সার্বদের মানবাধিকার লংঘনকে আঙ্কারা দিয়ে যাচ্ছে।

ফলে ৯৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মার্কিন তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইগলবার্গার জেনেভায় ন্যাটো পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিক, সার্বিয়ান নেতা রাদেভান কারাজদিক এবং সার্ব সামরিক অধিনায়ক জেনারেল ফুস্তিকসহ ৭ জন নবপশুর যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে বিচার দাবী করলেও আজও যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। আমেরিকা বারবার সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বললেও এ ব্যাপারে দীর্ঘ ৩১ মাস যাবত কোন বাস্তব ব্যবস্থা নেয়নি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তার এই অপেক্ষার নীতি বোসনিয়াকে ধ্বংসের নীতির নামান্তর বলে বিশ্লেষকদের অভিমত।

জাতিসংঘ ও বোসনিয়া

দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা এবং বিভীষিকা হতে যে ভীতি এবং বীভৎস পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা হতে পরিত্রাণ লাভ এবং ভবিষ্যতে কোন রাষ্ট্র বা জনগোষ্ঠী যাতে নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার না হয় তার নিশ্চয়তা বিধান এবং এইরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে আগ্রাসী শক্তিকে প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রত্যাশায় জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, দুর্বল, শক্তিহীন, অসহায় রাষ্ট্র এবং তার জনগণ আজ জাতিসংঘের ভূমিকা হতে বঞ্চিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। শান্তি, নিরাপত্তা এবং সহযোগিতার ক্ষেত্রে দুর্বলেরা আজ জাতিসংঘের উপর নির্ভর করতে পারছে না। ক্রমেই জাতিসংঘের উপর মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, জাতিসংঘের অনীহা, পক্ষপাতদুষ্টতা এবং যথার্থতা নিয়ে। সাম্প্রতিককালে বিকল্প জাতিসংঘ গড়ে তোলারও আহবান জানানো হয়েছে। বোসনিয়া-হার্জেগোভিনায় সার্বিয়ার অব্যাহত হত্যা, ধর্ষণ এবং ধ্বংসলীলা নিয়ে গোটা বিশ্ব যখন সোচ্চার, উদগ্রীব ও অস্থির ঠিক এমনি দুর্বিসহ পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ যে ভূমিকা প্রদর্শন করছে তা নিয়ে রীতিমত হতবাক হতে হয়। আজকাল মার্কিন এবং পশ্চিমাদের সামান্য স্বার্থেই জাতিসংঘ যেখানে সোচ্চার এবং ব্যতিব্যস্ত, মুসলিম রাষ্ট্র এবং জনগণের স্বার্থে সে আশ্চর্যজনকভাবে নির্লিপ্ত এবং অনুৎসাহী। ইরাকের অস্ত্র তুলে নেয়ার ব্যাপারে জাতিসংঘ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা শক্তি বাগদাদের উপর সামরিক প্রতিশোধসহ সব ধরনের অবরোধ আরোপে ব্যতিব্যস্ত অথচ বোসনিয়ার মুসলমানদের উপর বিগত ৩১ মাসের মত সময় ধরে সার্বিয়ার জঙ্গী এবং নরপশুরা যে নির্মম হত্যালীলা এবং অত্যাচার চালাচ্ছে সেসব সৈন্যদের নিরস্ত্রীকরণে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। কুয়েতের বাদশাহকে রক্ষা এবং তৈল ক্ষেত্রকে দখল করার জন্য জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত পেতে সময় লাগে না অথচ কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, আলজেরিয়া এবং বোসনিয়ার ব্যাপারে কোন কার্যকর ব্যবস্থাই গৃহীত হয় না। ব্যাপারটি এমন যে, মুসলমানরা মরুক তাতে খৃষ্টান এবং ইহুদীদের বরং লাভ। এ ব্যাপারে যত পারা যায় সিদ্ধান্ত বিলম্ব করা এবং কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়ার বিষয়টি লক্ষ্যণীয়। এ যেন

গোটা মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক অলক্ষ্য ও অঘোষিত ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধ। তারপরও লোক দেখানোর জন্য কিছু বৈঠক এবং হাঁকডাক ছাড়া না হলে বিষয়টি অভদ্রতার পর্যায়ে পড়ে যায় তাই ছোটখাট ভূমিকা পালনে জাতিসংঘ যে তৎপর নেই তা নয়।

বোসনিয়ার মুসলিম হত্যার পেছনে জাতিসংঘের গড়িমসি এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রই মূল কারণ। জাতিসংঘ সার্বদের বর্বরতাকে প্রশমিত করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি বরং মুসলমানরা বাঁচার জন্য এবং প্রতিরোধ গড়ার জন্য যাতে অস্ত্র হাতে নিতে না পারে তার উপর নিষেধাজ্ঞা বসিয়ে দিয়েছে। এটা যে কত বড় অমানবিক এবং বিদ্বেষপ্রসূত তা বলাইবাহুল্য। জাতিসংঘের ভূমিকার নিন্দা জানাবার ভাষা আমার জানা নেই। জাতিসংঘ বাহিনীর সামনে বোসনিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী হাফিজা তুরা সিলিককে সার্বরা হত্যা করলেও জাতিসংঘ কোন পান্টা ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয়নি। অথচ সোমালিয়ায় জাতিসংঘ বাহিনীর কোন সদস্য মারা গেলে হাজার হাজার বেসামরিক এবং নিরাপরাধ মানুষকে নির্বিচারে হত্যার নির্দেশ দিতে তার বাধে না। জাতিসংঘের রক্ষীবাহিনী নিয়েও আজ অনেক প্রশ্ন উঠেছে। এরা সার্বিয় বাহিনীকে মদদ এবং সহায়তা দিয়ে মুসলমানদের হত্যা করছে বলে অভিযোগ উঠলেও তা নিয়ে কোন তদন্ত বা ব্যবস্থা গ্রহণ আজও পরিকল্পিত হয়নি। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী যারা পশ্চিমা জগতের খৃষ্টান, ইহুদীর সন্তান এদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে বোসনিয়ায়। এরা সার্ব এবং ক্রোটদের সাথে মিলে বোসনিয় মুসলমানদের নির্মূল করে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রতিনিয়তই অভিযোগ উত্থাপিত হলেও জাতিসংঘ মহাসচিব এবং তার দোসররা রহস্যজনকভাবে নিরব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘ অবরোধের ব্যবস্থা নিলেও তা এমন সময় করা হয়েছে যখন বোসনিয়ার অধিকাংশ মুসলমান নিঃশেষের পথে। ফলে আজ জাতিসংঘের ভূমিকা নিয়ে কেউ আস্থা রাখতে পারছে না। বোসনিয়ায় জাতিসংঘের ভূমিকা নিয়ে সম্প্রতি ওআইসি সম্মেলনেও বেশ হতাশা ব্যক্ত করা হয়েছে। জাতিসংঘকে তাই যথাযথ, আন্তরিক ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে মুসলিম বিশ্বের সমস্যার সমাধান করা উচিত। বোসনিয়ার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের বিতর্কিত পদক্ষেপ গোটা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে জাতিসংঘের উপর আস্থাহীন করে তুলেছে। এতে পরিণতিতে গোটা বিশ্বে ঘটবে বিপর্যয়। মানবতা সত্যিকার অর্থে বিপন্ন হয়ে পড়বে। ফলে একটি বড় ধরনের

স্থিতিহীনতায় জড়িয়ে পড়বে সমাজ এবং এ থেকে বর্তমান পশ্চিমা জগতও রেহাই পাবেনা।

জাতিসংঘ বোসনিয়ার ব্যাপারে ত্বরিত কোন সিদ্ধান্ত না নেয়ার পেছনে সংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল বুটোস ঘালীর ঘৃণ্য মানসিকতা এবং মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাবই দায়ী বলে ইসলামী বিশ্বের বিশেষজ্ঞদের ধারণা। সেক্রেটারী জেনারেল নিজেই উগ্র খৃষ্টান সম্প্রদায়ের লোক এবং রক্ষণশীল ক্যাথলিক চার্চের সম্প্রদায়ভুক্ত। তার স্ত্রী একজন ইহুদী। তিনি রক্ষণশীল খৃষ্টীয় ধর্মের ভিত্তিতে বিশ্ব রাষ্ট্র গঠনের প্রত্যাশী বলে অনেক তথ্য প্রমাণ রয়েছে তার লেখা বিভিন্ন বই পুস্তকে। লন্ডনভিত্তিক “মুসলিম পার্লামেন্ট এর নেতা ডঃ কলিম সিদ্দীকির মতে “বোসনিয়া হার্জেগোভিনার উপর সার্বদের অমানবিক হামলা ইউরোপীয় খৃষ্টানদের একটি পরিকল্পিত ক্রুসেড” এই পরিকল্পনার এক ঘোর সমর্থক হচ্ছেন বুটোস ঘালি। তাই তিনি দীর্ঘ ৩১ মাস বোসনিয়ায় গণহত্যার ব্যাপারে ইতিবাচক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চাননি। বরং সার্বদের মুসলিম নিপীড়নের জন্য শুধু কালক্ষেপণই করেছেন এবং এ্যাকশান এ্যাকশান খেলায় দুনিয়ার মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। এরি মধ্যে বোসনিয়া সার্বদের ব্যাপক আক্রমণে হয়েছে বিধ্বস্ত, সর্বশান্ত এবং বিবর্ণ। সমসাময়িক বিশ্বের ইতিহাসে জাতিসংঘের এই পক্ষপাতদুষ্টতা এবং অবিবেচক নীতি বিশ্ব সংস্থার মর্যাদাকে ভুলুষ্ঠিত করেছে। তৃতীয় বিশ্বের শক্তিহীন দেশগুলোকেও জাতিসংঘের উপর আস্থা হারাতে বাধ্য করেছে। জাতিসংঘের পক্ষপাতপুষ্টতা নিয়ে বেশকিছু নমুনা নীচে পেশ করা হলোঃ চলতি বছরের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে সার্ব নরপত্তরা গোরাজদে শহরের উপর আক্রমণ চালিয়ে শহরটি প্রায় দখল করে ফেলে। পশ্চিমারা যথেষ্ট হুমকি দিতে থাকে। জাতিসংঘ শহরের বেসামরিক লোকজনকে রক্ষা করার মহান ব্রত(?) পালনের জন্য সার্বদের শহরের তিন কিলোমিটার দূরে সরে যেতে বলে। অন্যথায় বিমান আক্রমণের জুজুর ভয়ও যথারীতি দেখানো হয়। দিনক্ষণ ঠিক করে দেয়া হয় সার্বদের সরে যাওয়ার। শান্তি স্থাপনের জন্য জাতিসংঘের বিশেষ দূত ইয়াসুশি আকাশীকে পাঠান হয় গোরাজদে। তিনি সার্বদের সাথে আলোচনা করে বিশ্বকে জানান সার্বরা সরে যাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই। অতএব বিমান আক্রমণের কোন প্রয়োজন হবে না। সার্বরা সরে গেল এবং আক্রমণ বন্ধ করল বটে। কিন্তু মিঃ আকাশীর বক্তব্যের কভারে তারা জাতিসংঘ নির্ধারিত সময়ের পরেও প্রায় দু’দিন ধরে গোরাজদের উপর তাদের নির্মমতার পৈশাচিক উল্লাস

চালিয়ে তারপর সরে গেল। বিল ক্লিন্টন আকাশীকে মিথ্যাবাদী বললেন। বসনিয়ার প্রেসিডেন্ট ইজেতবেগোভিচ ইয়ামুশি আকাশী পদচ্যুতির দাবী করলেন। কিন্তু আকাশী জাতিসংঘের শান্তিদূত রয়েই গেছেন। আকাশী নিজেও সার্বদের পক্ষে সরাসরি কাজ করছেন বলে জানা গেছে।

সম্প্রতি জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল বোসনিয়ায় গিয়েছিলেন সার্বদের নেতা কারাজদিকের সাথে কথা বলে বিহাচের জাতিসংঘ নিরাপদ অঞ্চলে আটকে পড়া জাতিসংঘ বাহিনীকে উদ্ধার করতে। কিন্তু কারাজদিক দেখা পর্যন্ত করতে রাজী না হলে বুটোস ঘালী ব্যর্থ হয়ে নিউইয়র্কে ফিরে আসেন। অথচ এ নিয়ে সার্বদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। জাতিসংঘ কতটা সার্ব ঘেষা সেটা তাতেই অনুমান করা যায়।

বোসনিয়ায় আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ এবং এর বাস্তবতা

১৯৯২ সালের ১লা মার্চ স্বাধীনতা লাভ করার পর ২২শে মে দেশটি জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। ইউরোপীয় গোষ্ঠীসহ বিভিন্ন দেশ বোসনিয়া হার্জেগোভিনাকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু স্বাধীনতার পরই দেশটি বর্বর সার্বীয় বাহিনীর আক্রমণের শিকার হয়। বোসনিয়ার মুসলমানরা আজও সার্বদের নিপীড়ন এবং নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের লক্ষ্য। দেশটিতে ইতিমধ্যেই বয়ে গেছে একনদী তাজা রক্তের স্রোত। আজ সেখানে আহত ও স্বজনহারা মানুষের আহাজারি, শিশু সন্তানের বুকফাটা কান্নার রোল। বোমার বিকট গর্জনে জনজীবন বিপন্ন। খাদ্য ও পানির অভাবে তরতাজা মানুষ প্রতিনিয়তই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে বোসনিয়ায়। সে এক অভাবনীয় করুণ দৃশ্য। এই ভয়াবহ সার্ব গণহত্যা এবং অব্যাহত ধ্বংস হতে বোসনিয়ার মুসলমানদের রক্ষার জন্য মুসলিম বিশ্ব আজ ব্যর্থ, আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ অন্যান্য অমুসলিম দেশগুলো রহস্যজনক ভাবেই নিষ্ক্রিয়। যদিও বিভিন্ন সময় আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী বোসনিয় সংঘর্ষের ব্যাপারে বেশ কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবে তা বরাবরই ছিল অকার্যকর। নিম্নে এরূপ কতগুলো আন্তর্জাতিক উদ্যোগের উল্লেখ করা হলো :

একঃ ৩০শে মে নিরাপত্তা পরিষদ বোসনিয়ায় হামলার জন্য সার্বিয়া ও মন্টেনগ্রোর উপর বাণিজ্য ও তৈল নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

দুইঃ ৬ই জুন জাতিসংঘ মহাসচিব সারায়েভো বিমান বন্দরকে জাতিসংঘ বাহিনীর তত্ত্বাবধানে রাখার জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে জানান যাতে বোসনিয়ায় ত্রাণসামগ্রী সহজেই পৌঁছে দেয়া যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য, এর আগে ১২ই মে প্রচন্ড সার্ব আক্রমণের মুখে জাতিসংঘ বাহিনীকে সারায়েভো হতে তুলে নেয়া হয়েছিল।

তিনঃ ৮ই জুন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ৭৫৮ নং প্রস্তাব মোতাবেক বোসনিয়া হার্জেগোভিনায় জাতিসংঘের তদারকি আরো জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

চারঃ ১৭ই জুলাই বোসনিয়ার যুদ্ধরত মুসলিম, ক্রোট এবং সার্ব এই তিন পক্ষ ইউরোপীয় জোটের উদ্যোগে লন্ডনে এক যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু তা মেনে চলেনি সার্ব সৈন্যরা। ফলে যুদ্ধ বিস্তার লাভ করতে থাকে।

পাঁচঃ ১৩ই আগস্ট জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ বোসনিয়া হার্জেগোভিনায়

ত্রাণকার্যে বাধা দানকারী সার্বিয়ানদের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। সেদিন বোসনিয়ায় সার্বিয়ার মানবাধিকার লংঘনেরও নিন্দা করা হয়। যদিও সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা যায়নি সার্বদের বিরুদ্ধে। অথচ সার্বরা বোসনিয়ায় কোন ত্রাণ কার্যই চালাতে দেয়নি।

ছয় : ১৯শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ সার্ব-মন্টেনিগ্রো তথা সার্বিয়াকে জাতিসংঘ হতে বহিস্কার প্রস্তাব গ্রহণ করে।

সাত : ২২শে সেপ্টেম্বর সার্বিয়ার সদস্যপদ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ বাতিল ঘোষণা করে। এই পদক্ষেপ সার্বিয়ার উপর একটি নৈতিক চাপ সৃষ্টি করলেও তার আগ্রাসী তৎপরতাকে দমন করতে পারেনি।

আট : ৯ই অক্টোবর নিরাপত্তা পরিষদ তার ৭৮১ নং প্রস্তাবে বোসনিয়া হার্জেগোভিনার আকাশে সামরিক বিমান উড্ডয়নের উপর বাধা নিষেধ আরোপ করে। শুধুমাত্র জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর বিমানকে নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়। কিন্তু সার্বরা এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। অথচ এ ব্যাপারে কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি নিরাপত্তা পরিষদ।

নয় : ২৭শে নভেম্বর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ সার্বিয়ার বিরুদ্ধে নৌ অবরোধ আরোপ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ন্যাটো জোট এই অবরোধ সফল করার জন্য এড্রিয়াটিক সাগরে জাহাজ পাঠায়। কিন্তু অবরোধ কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

দশ : ১৯৯৩ সনের ২৯শে জুন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে বোসনিয়ার উপর হতে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। প্রস্তাবের পক্ষে আমেরিকা সহ ছয়টি দেশ ভোট দলেও বৃটেন, ফ্রান্স, স্পেন ও রাশিয়া এর বিরোধিতা করে।

এগার : ১৯৯৩ সনের ২৪শে জুন জেনেভায় যে বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে বোসনিয়ায় মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে এবং বোসনিয়ার মুসলমানদের উপর হতে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের পক্ষে ৮৮ ভোট এবং বিপক্ষে পড়ে ৩৪ ভোট। যদিও নিরাপত্তা পরিষদে এই প্রস্তাব পাশ হয়নি।

বার : '৯৩-এর ৯ই আগস্ট ভিয়েনায় এক বৈঠকে ন্যাটো সার্বিয়ান লক্ষবস্তুর উপর বিমান হামলা চালাবার সিদ্ধান্ত নেয়। জাতিসংঘ মহাসচিব বুট্রোস খালির চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রস্তাবনা রেখে ন্যাটো এই সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সার্বিয়ার প্রতিনিয়ত হামলার পর আজও ন্যাটোর বিমান হামলা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য সংস্থাগুলো বোসনিয়ার ব্যাপারে যেসব সিদ্ধান্ত এবং ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে তা যে কোনটাই মুসলমানদের রক্ষার

জন্য প্রণীত হয়নি তার প্রমাণ মেলে সার্বদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করার মধ্য দিয়ে। এইসব সিদ্ধান্ত না নিয়ে আত্মরক্ষায় প্রয়াসী মুসলমানদের উপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা বজায় রাখার খবর পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক এই সব সম্মেলন ও হাক ডাক বিশ্বের মানুষকে বিভ্রান্ত করারই একটি অপকৌশল বলে তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেছেন নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী এমি উইজেন্স। তিনি বলেছেন, “যদি বিশ্ব শক্তি সারিয়েতাকে রক্ষা করতে চায় তা হলে তা তারা পারে।”

সম্প্রতি ন্যাটো সার্বদের লক্ষ্যবস্তুর উপর বিমান হামলার যে সিদ্ধান্ত নেয় তাও যে একটি ভাঙতা মাত্র তা খুব স্পষ্ট। এই সিদ্ধান্তের পর বিমান হামলার ব্যাপারে ন্যাটো বারবার অপেক্ষার নীতি অবলম্বন করে। অথবা এমনভাবে হামলা চালায় যা হাস্যকর। ন্যাটোর এই লোক দেখানো পরিকল্পনার অন্তঃসারশূন্যতার কথা বলতে গিয়ে বোসনিয়া সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকারী লর্ডওয়েন ইন্ডিপেনডেন্ট পত্রিকায় এক সাক্ষাতকারে মন্তব্য করেন “সার্বীয় অবস্থানগুলোর উপর ন্যাটোর বিমান হামলার হুমকি একটি ভাঙতা মাত্র।”

জাতিসংঘসহ ন্যাটো এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বোসনিয়ার ব্যাপারে যে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে তা মানুষ মাত্রই জানে। খোদ আমেরিকায়ও এই ব্যর্থতা নিয়ে কথা উঠেছে। মার্কিন সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাবলিকান নেতা এবং আগামী নির্বাচনে সম্ভাব্য রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী রবার্ট ভোন প্রকাশ্যেই বলেছেন, ‘বোসনিয়ার সার্বিক যুদ্ধ বন্ধের জন্য ন্যাটো ও জাতিসংঘ যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে তা অমার্জনীয়। এজন্য তিনি জাতিসংঘের চাঁদা কমিয়ে দেবারও হুমকি প্রদান করেছেন।’

এর আগে রিপাবলিকান নেতা প্রয়াত নিক্সন বোসনিয়ার মুসলমানদের রক্ষার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ব্যর্থতার কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি তার সর্বশেষ গ্রন্থ ‘বিয়েন্ড পিস’-এ বলেন, ‘শুনতে খারাপ লাগলেও এটি নির্মম সত্য যে, সারিয়েভোর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান না হয়ে খৃষ্টান বা ইহুদী হলে সত্য জগত শহরটির অবরোধ এমন অবস্থায় পৌছতে দিত না যেখানে জনাকীর্ণ বাজারে সার্বদের গোলাবর্ষণ সম্ভব হতে পারে।’

বাস্তবিক পক্ষে, মুসলমানদের যে কোন স্বার্থের ব্যাপারে বিশ্ব সমাজ আজ বিরুদ্ধ। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো খৃষ্টান এবং ইহুদী প্রভাবিত হওয়ায় কোন কার্যকর ব্যবস্থাই আজ মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় গৃহীত হচ্ছে না। বোসনিয়ার ব্যাপারটিও তাই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মুখে ইতিহাসের এক ট্রাজেডিতে পরিণত।

মুসলিম বিশ্ব এবং ওআইসি'র দেউলিয়াপনা

বোসনিয়ায় মুসলিম হত্যা সম্মিলিত খৃষ্টান ষড়যন্ত্রেরই ফসল। ইউরোপ হতে মুসলমানদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যেই বোসনিয়া-হার্জেগোভিনাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে গোটা ইউরোপ। লন্ডন ভিত্তিক “মুসলিম পার্লামেন্ট” নেতা ডঃ কলিম সিদ্দীকি তাই বলেছেন, “বোসনিয়া-হার্জেগোভিনার উপর অমানবিক হামলা ইউরোপীয় খৃষ্টানদের এক বর্বরোচিত ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড।” এই ক্রুসেডের ভয়াবহতা যে কত মর্মান্তিক ও অমানবিক তা বিগত ১৫ মাসে সার্বদের হত্যাকাণ্ড, ধ্বংসলীলা এবং অভিযান হতেই স্পষ্ট বুঝতে পারছে গোটা বিশ্বের মনুষ্য। বিগত কয়েক শতকে কোন দেশে এমন বীভৎস ধরনের এবং বর্বরোচিত কায়দায় মানুষ হত্যার নজির আছে কিনা তা নিয়ে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করেছেন। হিটলারের নাজি নির্যাতনও সার্বদের উগ্রতা এবং মর্মস্পর্শী নিপীড়নের কাছে হার মানে। লজ্জা পায় মধ্যযুগীয় বর্বরতা। বোসনিয়ার প্রেসিডেন্ট আলিজা ইজেতবেগভিসের মতে, “সার্বদের হত্যা কৌশল এবং নিপীড়নের পদ্ধতি কোন মানুষের আচরণের মধ্যে পড়ে না”। রক্ত পিপাসু সার্ব খৃষ্টানদের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বোসনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট ইজুপ গনিক বলেছেন, “সার্বিয়ান সেনাদের আচরণ দুনিয়ার সকল বর্বরতার ইতিহাসকে লান করে দিয়েছে, বোসনিয়ার প্রধান ধর্মীয় নেতা রইসুল উলামা ইয়াকুব ইফেত্তি সেলিমাক্কির ভাষায়, “বোসনিয়া বাতাস আজ একটি রক্তের বিশ্রী দুর্গন্ধে ভারাক্রান্ত। সার্ব সেনাদের বর্বরতা যে কতটা বীভৎস ইতিহাসে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া না।” বোসনিয়ায় মুসলিম নির্যাতন নিয়ে বিক্ষুব্ধ হয়েছে গোটা বিশ্বের মুসলমানরা। এর নিন্দা জানিয়েছে প্রায় সকল মুসলিম প্রধানরাই। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের একজন বিশিষ্ট আলেম হজ্জাতুল ইসলাম মাহমুদ মোহাম্মদ আরাকী বোসনিয়ায় সার্বদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, “মুসলিম জনগণের উপর পাইকারী হত্যাযজ্ঞ ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ খুবই মর্মান্তিক এবং মানবাধিকারের চরম লংঘন। বিশ্বে এদের বর্বরতার নজীর মেলা ভার।” ইরানের মজলিশ বা পার্লামেন্টের স্পীকার আলী আকবর নাতেক নূরী বোসনিয়ায় সার্বীয় ধ্বংসযজ্ঞে বিশ্বয় প্রকাশ করে বলেন, “কমিউনিজমের পতনের মধ্য দিয়ে বলকানে যে মর্মান্তিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা মানবতার পরিচয়কে ভুলুণ্ঠিত করেছে। মুসলমানদের উপর সার্বদের অত্যাচার অমানুষিক এবং অমানবিক।”

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ বোসনিয়ায় সার্বদের নির্যাতনকে অমানবিক এবং বর্বরোচিত বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং মুসলিম জাতিগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে তারুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়েছেন। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ বোসনিয়ায় মুসলিম নির্যাতনকে নিন্দা জানিয়েছে এবং সেখানকার মুসলমানদের রক্ষায় সেনাবাহিনী পাঠিয়েছে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশ যেমন-পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, লিবিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বোসনিয়ায় সার্বদের নিপীড়নের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কিন্তু পশ্চিমা ষড়যন্ত্র এবং খৃষ্টানদের তৎপরতা বন্ধে মুসলিম বিশ্বের ভূমিকা ছিল খুবই দুঃখজনক। বোসনিয়ার মুসলমানদের উপর মানবতা বিরোধী সার্বদের ধর্ষণ ও হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে যে সোচ্চার প্রতিবাদ উঠা প্রয়োজন ছিল তা হয়নি। অবশ্য এর পেছনেও কারণ রয়েছে। তার কারণ সোচ্চার প্রতিবাদ উঠা প্রয়োজন ছিল তা হয়নি। অবশ্য এর পেছনেও কারণ রয়েছে। তার কারণ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামরিক শক্তি পশ্চিমাদের নিয়ন্ত্রণে। ইরাক সরাসরি আমেরিকার আক্রমণে স্থবির। ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, লিবিয়া ও সুদান আমেরিকা ইউরোপের চাপের মুখে দুর্বল। আলজেরিয়ায় ইসলামপন্থীরা নিপীড়নের মুখে নিঃশেষের পথে। মুসলিম বিশ্বের প্রায় সবগুলো দেশই রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, বাদশাহী শাসন কিংবা সামরিক শাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ। ফলে ঐক্যের সূত্র আজ নিখর। ওআইসির ৫২টি মুসলিম দেশও বোসনিয়ার নিপীড়ন বন্ধে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কুটনৈতিক যোগ্যতা প্রদর্শন ও অন্যান্যভাবে মুসলমানদের দক্ষতা ও প্রভাব বিস্তারে ওআইসি যে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে তা ইতিহাসেরই আরেকটি ট্রাজেডি। এই দুঃখজনক পরাজয় বোসনিয়ার মুসলমানদের পরাজয়ের চেয়ে আরো ভয়াবহ। কেননা মুসলমানরা ছিল স্বাধীন এবং বিজিত জাতি। অথচ আজ আন্তর্জাতিক ভাবেই মুসলমানরা ভিখেরী এবং অসহায় জাতির কলঙ্কে নিজেদের ভাগ্যকে বরবাদ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। বিশ্ব নেতৃত্বে আমেরিকা এবং পশ্চিমা দেশগুলোর প্রচণ্ড মুসলিম বিদ্বেষী ভূমিকার নিকট মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানরা যে নিরব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে তা বিশ্বের সোয়াশ কোটি মুসলমানের মনকে করেছে মর্মান্বিত। আজ ইউরোপের বুকে সম্পূর্ণ শক্তিহীন ও নিরসত্র অবস্থায় বোসনিয়ার মুসলমানরা যে সাহস ও বীরত্ব নিয়ে এগিয়েছে গোটা মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের তা তেমন নাড়া দিতে পারেনি বলেই মনে হয়। দু'লাখেরও বেশী আপনজনের লাশ ও রক্তের শোককে দূরে ঠেলে বোসনিয়ার মুসলমানরা যে আত্ম মর্যাদাবোধ এবং ঈমানী চেতনায় লড়াই করে যাচ্ছে, সেই চেতনা কতদূর দেখাতে পেরেছেন মুসলিম নেতারা তা আজ বিশ্বিয়ে ভাবতে হয়।

মুসলিম দেশগুলোর ঐক্যসংস্থা ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)। ৫২টি দেশের এই সংস্থা আজ এক দুঃখজনক পরিণতি ডেকে এনেছে মুসলিম জনগণের জন্য। ব্যর্থতা, অযোগ্যতা এবং দেউলিয়াপনা ও আইসকে ঘিরে রেখেছে। ১৯৯২ সালের ১৬ই জুন ইস্তাম্বুলে জরুরী ৫ম পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বোসনিয়ার মুসলমানদের রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে তৎপরতা চালাবার লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য। কিন্তু এ সম্মেলন নিন্দা জ্ঞাপন এবং জাতিসংঘের প্রতি সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের আহবানের মধ্য দিয়েই এই জরুরী সম্মেলনটি সমাপ্ত হয়। ঐ বছরের পহেলা ও ২রা ডিসেম্বর ওআইসি ৬ষ্ঠ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ডাকে জেদ্দায়। উদ্দেশ্য বোসনিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা এবং ব্যবস্থা গ্রহণের রূপরেখা প্রণয়ন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, যুদ্ধ বন্ধে পশ্চিমাদের প্রতি আহবান জানানো ছাড়া কোন কার্যকরী ব্যবস্থাই সে সম্মেলনে গৃহীত হয়নি। উল্লেখ্য যে, বিশ্বের ৫০টি মুসলিম দেশ মিলে কোন কার্যকরী ব্যবস্থাই সে সম্মেলনে গৃহীত হয়নি। উল্লেখ্য যে, বিশ্বের ৫০টি মুসলিম দেশ মিলে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের সাহস করেনি ঐ সম্মেলন। ৯৩ এর প্রথমদিকে ১১ জানুয়ারী সেনেগালের রাজধানী ডাকারে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার আরো একটি ক্ষুদ্রে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বোসনিয়ার প্রেসিডেন্ট আলিজা অংশগ্রহণ করেন। আলীজা এই সম্মেলনে অত্যন্ত আবেগভরা ভাষায় বোসনিয়ার মুসলমানদের অসহায় এবং সংকটজনক অবস্থাকে তুলে ধরেন এবং এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ওআইসিকে চাপ দেয়া এবং যোগাযোগ রক্ষা করার আহবান জানান। কিন্তু বোসনিয়ায় যুদ্ধ বন্ধে জাতিসংঘকে আহবান জানানো ব্যতীত এই সম্মেলন আর কোন সফলতাই অর্জন করতে পারেনি। গত বছরের ২৫শে এপ্রিল হতে ৫ দিনের ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানের ইসলামাবাদে। এতেও বোসনিয়া সম্পর্কে আলোচনা হয় কিন্তু তার কোনটাই সফলতার মুখ দেখেনি। কারণ আমেরিকা, ইউরোপ, ইসি এবং জাতিসংঘ সবাই মুসলমানদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে। ওআইসি তার তৎপরতায় কোন সফলতার মুখ দেখেছে বলে মনে হয়।

ওআইসি ছাড়াও প্রভাবশালী মুসলিম দেশগুলোর ভূমিকা এবং কার্যকলাপ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে মুসলমান জনগণের। একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সম্পদ এবং সহযোগিতায় আমেরিকা এবং বৃটেনের হাত অত্যন্ত শক্তিশালী। বিশ্বের দেশে দেশে মুসলমানদের হত্যার পেছনে কৌশল এবং অস্ত্র যোগান দিয়ে যাচ্ছে এরা। আমেরিকা ইরাককে ধ্বংস করার জন্য পর পর দেশটিতে হামলা চালাচ্ছে, ইরান, আফগানিস্তান এবং আলজেরিয়ার ইসলামী

বিপবকে নস্যাৎ করার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করছে। ইসরাইলের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে আজ তিন যুগ ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংস লীলা চালিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান, লিবিয়া ও সুদানকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করার অপকৌশল চালাচ্ছে। আর এর সহযোগিতা দিচ্ছে বৃটেন। তাছাড়া বৃটেন বোসনিয়ার মুসলমানদের হত্যার জন্য সার্বদের অস্ত্র এবং আন্তর্জাতিক সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে। তারপরও সৌদী আরব, কুয়েত, আরব আমীরাত এবং কাতারসহ আরো কয়েকটি দেশ বৃটেন ও আমেরিকার বিভিন্ন সংস্থাগুলোতে অটেল অর্থ সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এইসব মুসলিম দেশ যদি পাশ্চাত্যের সাথে তাদের সম্পাদিত চুক্তিগুলো বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তাহলে বোসনিয়ার মুসলমানদের রক্তপাত বন্ধ করা খুবই সহজ হবে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের উপর পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রও বন্ধ হতে বাধ্য। শুধু প্রয়োজন মুসলিম ঐক্য এবং সাহসিক পদক্ষেপ। আর এ ব্যাপারে ওআইসিকে আরো বেশি কার্যকর এবং শক্তিশালী করা যেতে পারে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে বোসনিয়া সংকটই হলো মুসলিম দুনিয়ার সবচেয়ে জটিল এবং ভয়াবহ সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হলো অত্যাচারির কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়া এবং একটি আন্তর্জাতিক বাহিনীর মাধ্যমে সার্বিয়দের নিরস্ত্র করা। আর তা না হলে মুসলমানদের উপর হতে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিতে হবে যাতে বোসনিয়ার মুসলমানরা নিজেরাই নিজেদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। মুসলিম বিশ্বের এখন প্রয়োজন হচ্ছে বোসনিয়াকে বিভক্ত করার পশ্চিমা ষড়যন্ত্রকে রুখে দাঁড়ানোর কৌশল গ্রহণে এগিয়ে আসা। যদিও এটি এই মুহূর্তে কতটা সফল হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তবে ১৪ ও ১৫ই ডিসেম্বর মরক্কোর কাসাব্লাংকায় অনুষ্ঠিত ৭ম ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে বোসনিয়ার ব্যাপারে ৫২ জাতির এই সংস্থার নেতৃবৃন্দ একটি মতৈক্যে পৌছান। তারা জাতিসংঘকে কার্যকর ভূমিকা পালনের ব্যাপারে এবং শান্তিরক্ষী বাহিনীকে আরো জোরদার করার ব্যাপারে একমত হন। নেতৃবৃন্দ বোসনিয়ার ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণেও মতৈক্যে পৌছান। এ ব্যাপারে সৌদী আরব, মিসর, ইরান, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, সেনেগাল ও তুরস্ককে নিয়ে একটি যোগাযোগ গ্রুপ গঠিত হয়। এই গ্রুপ শীঘ্রই জেনেভায় তার পশ্চিমী প্রতিপক্ষের সাথে আলোচনা করবেন বলে ওআইসির মহাসচিব হামিদ আল গাবিদ জানান। তবে ভবিষ্যতেই বলতে পারে বোসনিয়ার ব্যাপারে মুসলমানরা কতটা সন্তুষ্ট হবে।

ভ্যাঙ্গ-ওয়েন পরিকল্পনা ও ইসি'র ষড়যন্ত্র বিভক্তির পথে বোসনিয়া

বোসনিয়ার উপর সার্বরা যখন খড়গহস্ত এবং মুসলমানদের নির্মূলের কাজে সর্বশক্তি নিয়ে ব্যস্ত তখন খৃষ্টান জগত, পশ্চিমা দেশসমূহ, জাতিসংঘ এবং ইসির সদস্য রাষ্ট্রগুলো বোসনিয়াকে খণ্ড বিখণ্ড করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মুসলমানদের আলাদা অস্তিত্ব বিলোপের জন্যই এ বিভক্তির লক্ষ্য। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, ক্রোসিয়া, স্লোভেনিয়া, সার্বিয়া প্রতিটি রাষ্ট্রেই বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর লোক রয়েছে। রয়েছে মুসলমানও। কিন্তু সেই সব রাষ্ট্রগুলোকে জাতিগত বা সম্প্রদায়গত ভিত্তিতে আলাদা আলাদা ভূখণ্ডে ভাগের প্রশ্ন উঠেনি। অথচ বোসনিয়ার সার্ব এবং ক্রোয়াট সংখ্যালগুদের জন্য তাদের আলাদা ভূখণ্ডের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যসব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যালঘু হয়ে সার্বিয়ান কিংবা ক্রোশিয়ান শাসনের অধীনে থাকতে পারে, কিন্তু মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধান হবার কারণে এর অধীনে বোসনিয়ায় বসবাস করা যাবে না- এই হীনমন্যতা, হীন আত্মমর্যাদাবোধ এবং সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি খৃষ্টান ও ইহুদীদের যে কতটা অমানুষ, বর্বর এবং ইতর করতে পারে বোসনিয়ায় মুসলমানদের রক্ত শোষণ হতেই তা স্পষ্ট। বোসনিয়ায় যাতে মুসলিমরা কোন প্রকার কর্তৃত্বই বজায় রাখতে না পারে তার জন্য জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বোসনিয়াকে ভাগ করে দেয়ার একটি চক্রান্ত সূচিত হয় ভ্যাঙ্গ-ওয়েন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে। জাতিসংঘের বোসনিয়া সংক্রান্ত দূত সাইরাস ভ্যাঙ্গ এবং ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের মধ্যস্থতাকারী লর্ড ওয়েন বোসনিয়াকে দশটি অঞ্চলে ভাগ করার পরিকল্পনা পেশ করে। এই পরিকল্পনায় তিনটি অঞ্চল মুসলমানদের জন্য রেখে বাকি সাতটি অঞ্চল সার্ব এবং ক্রোয়াটদের জন্য নির্ধারণ করা হয়। মুসলমানদের অঞ্চলগুলো এমনভাবে প্রস্তাব করা হয়েছে যার চারদিকে থাকবে সার্ব এবং ক্রোয়াটরা। লক্ষ্য হলো, মুসলিম অঞ্চলগুলোকে এমনভাবে রাখা হবে যাতে এরা না পায় কোন বাণিজ্য সুবিধা, না পায় স্বাধীন অস্তিত্ব। সব সময়ই মুসলমানদের সার্ব এবং ক্রোয়াটদের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকার ব্যবস্থা করা হয় ভ্যাঙ্গ-ওয়েন পরিকল্পনায়। যদিও সার্ব পার্লামেন্ট এই প্রস্তাবকে নাকচ করেছে। বোসনিয়ার প্রেসিডেন্ট

ইজ্জেতবেগভিস এবং ভাইস প্রেজিডেন্ট ইজুপ গনিকও ভ্যান্স-ওয়েন বিভক্তি প্রস্তাবকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। গনিক তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, “আমি আমার মৃত্যু পরোয়ানা স্বাক্ষর করার জন্য নির্বাচিত হইনি। আমি যুদ্ধ চালিয়ে যাব। তবুও কোন বিভক্তি মেনে নেব না।” এখানে উল্লেখ্য যে, ৯৩ সালের ২২ই জুন কোপেনহেগেন শীর্ষ সম্মেলনও ভ্যান্স-ওয়েন পরিকল্পনাকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে।

ইসি, ক্রোশিয়া ও সার্বিয়া ভ্যান্স-ওয়েন পরিকল্পনা মেনে না নিলেও সার্বিয়া কর্তৃক বোসনিয়াকে তিনভাগে বিভক্ত করার পরিকল্পনাকে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করে। এতে সার্বিয়ার প্রতি যে পশ্চিমারা সব সময়ই শুভ দৃষ্টি দিয়ে এসেছে এবং মুসলমান হত্যায় বরাবরই সহযোগিতা দিয়ে আসছে সেই চরম সত্যটিই প্রমাণিত হলো। সার্বিয়ার বিভক্তি প্রস্তাবের আলোকে বোসনিয়া এখন ধর্মীয় ভিত্তিতে তিনটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হতে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, এই বিভক্তি মেনে নেয়ার জন্য বোসনিয় প্রেসিডেন্টকে নানাভাবে চাপ দিচ্ছে ইসি, জাতিসংঘ এবং আমেরিকা। একথা আলীজা নিজেও স্বীকার করেছেন এক সাংবাদিক সম্মেলনে। তাছাড়া গোটা সারায়েভোকে অবরোধ রেখে এবং বোসনিয়ার উপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত রেখে বিভক্তির পথে অগ্রসর হবার জন্য বোসনিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। জাতিসংঘ। এমনি অবস্থায় দেশের সোয়া দু’লাখ মুসলমানের মৃত্যু, ৬০ হাজার মহিলার বলৎকার এবং ১৫ লক্ষ মুসলমানের উদ্ধাস্তু জীবনের মর্মবেদনার প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আলীজা ইজ্জেতবেগভিস পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রকে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। তিনি তাই বলেছেন “বোসনিয়া বিভক্তি মেনে না নিয়ে গোটা দেশের মানুষকে মরতে দিতে পারি না।” বোসনিয়ার জন্য এটা একটা ট্রাজেডিই বলতে হবে। আর এই ট্রাজেডি বরণ করে নেয়া ছাড়া কিইবা পথ খোলা ছিল বোসনিয়ার সামনে? গোটা মুসলিম বিশ্ব যখন বোসনিয়ার মুসলমানদের প্রাণ রক্ষায় চরমভাবে ব্যর্থ তখন পরাজয় মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন পথ তাদের সামনে খোলা ছিল না। সম্প্রতি জেনেভায় বিভক্তি প্রশ্নে যে আলোচনা হয়েছে তাতে তিনটি ভাগ দেশটি বিভক্ত হবার বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন শুধু বাকি আছে বিভক্তির সীমা পরিসীমা নির্ধারণের পর বিষয়টির নিষ্পত্তি করা। ৯৩ সালের জেনেভা বৈঠক যা ২০ আগস্ট মূলতবী হয়ে যায় তাতে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল এরূপঃ সারায়েভো জাতিগত ভিত্তিতে তিনটি ভাগে বিভক্ত হবে। এই সেক্টরগুলোর প্রশাসনিক দায়িত্ব থাকবে জাতিসংঘের উপর। সারায়েভোতে কোন

পক্ষেরই সৈন্য থাকবে না। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সারায়েভোর অধীনে সমগ্র দেশকে ১০টি জেলায় ভাগ করা হবে। বোসনিয়ার তিনটি সম্প্রদায় তাদের তিনটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের চূড়ান্ত মানচিত্র এবং প্রজাতন্ত্রগুলোর একটি ইউনিয়ন গঠন পর্যন্ত জাতিসংঘ সারায়েভোর প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবে। যদিও প্রেসিডেন্ট আলীজা এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং সারায়েভোকে বিভক্ত করার প্রস্তাবকে তিনি নাকোচ করে দেন। তবে এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, বোসনিয়ার বিভক্তির ব্যাপারটি এখন চূড়ান্ত। এই ভাগাভাগির মাধ্যমে ইউরোপের এই অঞ্চল হতে মুসলমানদের চিরতরে বিদায়ের পথটিই খোলসা করতে চাইছে পশ্চিমারা। তারা জানে সার্ব এবং ক্রোয়েটদের দ্বারা ঘেরা ছোট্ট এলাকায় বোসনিয়ার মুসলমানরা তাদের অস্তিত্ব নিয়ে কোন ক্রমেই টিকে থাকতে পারবে না। ফলে মুসলমানরা বাধা হয়েই মিশে যাবে সার্ব এবং ক্রোয়েটদের সাথে। বিলীন হবে মুসলমানদের অস্তিত্ব।

বোসনিয়ার ব্যাপারে আজ খৃষ্টানদের এই বর্বরোচিত পদক্ষেপ স্পেন হতে মুসলমানদের বিতাড়নের স্বৃতিকেই মনে করিয়ে দেয়। খৃষ্টানরা সেখানকার মুসলমানদেরকেও বর্বরতম কায়দায় ইউরোপ হতে নির্মূল করে ১৪শ ও ১৬শ খৃষ্টাব্দীতে। মুসলমানদেরকে নিঃশেষ করার জন্য খৃষ্টানরা তাদের নামাজ নিষিদ্ধ করে। মুসলমানদের খৃষ্টানদের মত জীবন যাপনে বাধ্য করে। আলাদা কর ধার্য করা হয় মুসলমান হবার কারণে। মুসলমানদের ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি পুড়িয়ে ফেলা হয়। তাদের শুকরের মাংস খেতে বাধ্য করা হয়। আরবী ভাষা ও ইসলামী পোশাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য মুসলমানদের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা হয়। তারপরও খৃষ্টানদের তৃপ্তি মেটেনি। পরিশেষে ৪৬ লাখ ৭৫ হাজার মুসলমানকে স্পেন হতে বিতাড়িত করা হয়েছিল। তিউনিসিয়া ও তুরস্কে পালাবার পথে এই বিতাড়িত মুসলমানদের তিন চতুর্থাংশই পথে মারা যায়। বোসনিয়ার মাটি হতে একইভাবে মুসলমানদের নিঃশেষ করার তৎপরতা চালাচ্ছে খৃষ্টানরা। তবে এবারে তাদের নির্মূল অভিযান হচ্ছে বড়ই মর্মান্তিক এবং পৈশাচিক। সভ্য দুনিয়ার ইতিহাসে বোসনিয়ার নির্মমতা এবং পশুত্ব তুলনা করার

বোসনিয়ায় সার্বিয়ার বর্বরোচিত নিপীড়নের করুণ কাহিনী

□ হাজার-হাজার ক্ষুধার্ত মানুষ ক্ষুধা ও পিপাসার প্রচণ্ড তাড়নায় জড়ো হয়েছে একটি রিলিফ বিতরণ কেন্দ্রের সামনে। বিশাল লাইন হয়েছে বিবর্ণ মানুষের। এমন সময় অতর্কিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লো সার্বিয়ার নরঘাতক সেনারা। চারিদিক হতে শুরু হলো এলোপাথারি গুলি। সংগে সংগেই কয়েক শত নারী, শিশু ও পুরুষের লাশ মাটির কোলে ঢলে পড়লো। রক্তের স্রোতে তখন গোটা এলাকা একাকার। এরি মধ্যে আরো কয়েক শত আহত মানুষের কাতর দেহ মাটিতে গড়াগড়ি করতে থাকলো। তাদের বুকভাঙ্গা চীৎকারে পুরো এলাকার বাতাস ভারী হয়ে উঠলো। অথচ পাষাণ সার্ব সেনারা তখন বিজয়ের উল্লাসে মেতে উঠলো আর মুসলমানদের মৃত্যুর দৃশ্যকে মনভরে উপভোগ করতে থাকলো।

□ সুঠাম দেহের তরতাজা মুসলিম যুবকদের ধরে নিয়ে বিভিন্ন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে মজা করা সার্ব খৃষ্টান নরপশুদের একটি নিয়মিত কাজ। মাঝে মাঝেই এদেরকে কোরবানীর পশুর মত জবাই করে ওরা। যুবকদের জবাই করার পর কাঁচা রক্তকে ব্যাগে পুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আহত সার্ব সেনাদের রক্তের যোগান দেয়াই এর উদ্দেশ্য। এক রিপোর্ট হতে জানা যায় একটি টর্চার সেলে একদিনেই ৬৫০ জন মুসলিম যুবককে জবাই করে তা দিয়ে আহত সার্ব সেনাদের জীবনের আলো ফেরাবার চেষ্টা করা হয়।

□ একটি গ্রামীণ এলাকা। শহরের উপকণ্ঠ। পাশেই সার্ব সেনাদের ক্যাম্প। একটি সেনাদল মুসলমানদের ঘরে ঘরে ঢুকে প্রায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। মেয়েদের বিবস্ত্র করে পাশাপাশি দাঁড় করানো হয়। হাতগুলো পিচমোড়া বেঁধে এরপর গণধর্ষণ। তাতেও পশুদের লালসা মেটেনি, বর্বরতা কমেনি। ধর্ষণের পর এক এক করে গুলি করে হত্যা করা হয় এইসব অসহায় এবং নিরপরাধ মানুষকে পত্র-পত্রিকায় এ খবর ফলাও করে ছাপানো হয়। কিন্তু এতে হৃদয় কাঁপেনি জাতিসংঘ কিংবা সাম্রাজ্যবাদী খৃষ্টান ও ইহুদীদের।

□ পশ্চিমা এক প্রতিবেদকের রিপোর্ট। সার্ব সেনারা নারী ও কিশোরীদের ধরে নিয়ে ধর্ষণ করে। একের পর এক পশুদের মনোরঞ্জন চলে। তারপর মেয়েদের

শরীরে গ্যাসোলিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। পাশেই কৌতুকে মেতে থাকে নরাধমসার্বসেনারা।

□ আরেক দিনের ঘটনা। কয়েক শত মেয়েকে বর্বরোচিতভাবে মনোরঞ্জন করার পর এইসব আহত এবং বিবস্ত্র মেয়েকে লাইন ধরিয়ে গুলি করা হয়। এদের লাশ নদীতে বা বিড়াল কুকুরের আহারের জন্য জঙ্গলে ফেলে দেয়।

□ একজন পশ্চিমা সাংবাদিকের বিবরণ। সার্ব সেনারা মুসলমানদের হত্যার পর তার কান কেটে বা চোখ উপড়িয়ে তার লাশ বিকৃত করে। কোন কোন সময় লাশের মধ্যে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। কখনও গরম ছুরি দিয়ে লাশের বুক ও কপালের গোশত কেটে খৃষ্টানদের ত্রুশ চিহ্নিত করা হয়। যেন এর মাধ্যমে লাশকে খৃষ্টানে পরিণত করে সার্ব সেনারা। কখনও গরম পানিতে সিদ্ধ করেও মুসলিম যুবকদের হত্যা করা হয়।

□ মরক্কোর রাবাত প্রিন্স সুলতান মসজিদের ইমাম শেখ সালেহ আলী সোমাইল বোসনিয়া সফর শেষে ফিরে এসে বলেন, সার্ব বাহিনী মুসলমানদের হত্যা করার পর তা পশু খাদ্যের কারখানায় প্রেরণ করে এবং এগুলো পশুদের খাদ্য তৈরির উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে।

□ বোসনিয়া হতে আগত একজন প্রত্যক্ষদর্শী সৌদী আরবের পত্রিকায় এক মর্মস্পর্শী বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি বলেন, সার্ব সৈন্যরা একজন শিশুকে তার পিতার সামনে আগুনে পুড়ে পিতাকে তার গোসত খেতে বাধ্য করে এবং কিছুক্ষণ পর নির্বাক পিতাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

□ মক্কার আবদুল আজিজ মসজিদের ইমাম শেখ নাসের আল মাইমানী। তিনি বোসনিয়া সফর করেন এবং সেখান হতে ফিরে এক লোমহর্ষক তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেছেন, সার্বদের নির্যাতন কল্পনাভীত এবং ভিয়েতনাম ও নাজী জার্মানী কিংবা সোভিয়েত ইউনিয়নের মর্মন্তুদ নির্যাতন কাহিনীর চেয়ে ভয়াবহ। তিনি এই হত্যাকাণ্ডকে বর্বরতা বা অমানবিক বললে ছোট করে দেখানো হবে বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন সার্ব বাহিনী শিশুদের জবেহ করে মাথা দেহ হতে আলাদা করে নেয় এবং তা দিয়ে ফুটবল খেলে। বন্দীদের চোখ উপড়ে ফেলে। পুরুষদের পুরুষাঙ্গ কর্তন করে। মহিলাদের জরায়ুতে রড ঢুকিয়ে বা পুড়িয়ে দিয়ে বিকৃত করে দেয়ার ঘটনাও তিনি উল্লেখ করেন। সভ্য জগতের আজকের বিশ্বে এইসব বর্বর ঘটনা কি বিশ্বাস করা যায়? তবুও অমানুষ এবং পশুতুল্য সার্ব সৈন্যরা এমন জঘন্য কাজটিই করছে নির্দিধায়।

□ হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকায় এক সার্ব সৈন্যের একটি হত্যার কাহিনী প্রকাশিত হয়। ইউরিস্লাব হিরাকী নামক এই ২১ বছরের যুবকটি মুসলিম সেনাদের হাতে বন্দী হয়। হিরাকীর মতে, সে বিভিন্ন মুসলিম পরিবারকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। সে স্বীকার করেছে, একটি মুসলিম পরিবারকে হত্যার পূর্বে আমরা বললাম-‘তোমরা ভয় কর না। আমরা তোমাদের কষ্ট দেব না। তোমরা শুধু দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াও। অথচ আমরা তাদেরকে হত্যার জন্যই এসেছি। তখন আমাদের অধিনায়ক হত্যা করার নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে আমি ও আমার সাথীরা গুলি চালাই এবং লোকদেরকে হত্যা করি। ম্যাক্সি পরিহিত একটি ছোট শিশু ভয়ে হৃদয় গলানো আত্ননাদে তার দাদীর পেছনে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করে। আমরা তার বুকটিও গুলিতে ঝাঝড়া করে দেই।

□ ইউরিস্লাব হিরাকি তার কৃতকর্মের আরো কিছু তথ্য প্রকাশ করে। সে বলে, আমরা একটি গ্রামের পাশ দিয়ে যাবার সময় একটি পরিবারকে ধরে নিয়ে আসি এবং তাদেরকে হত্যা করি। সে ৩ জন মুসলিম সৈন্যের গলা কেটে হত্যা করেছে বলেও স্বীকার করে। হিরাকী ৮/৯ জন যুবতীকে ধর্ষণ এবং তারপর হত্যার লোমহর্ষক তথ্যও প্রদান করে।

□ এক সূত্রে প্রকাশ, একদল সার্ব সেনা একটি রুটি তৈরির কারখানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা ঐ কারখানার মুসলমান লোকদের রুটির চুলোয় ঢুকিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করে। এবং অটহাসিতে ফেটে পড়ে।

□ কেয়াটাস বন্দী শিবির। পাশেই ছিল একটি লোহার খনি। সার্ব সৈন্যরা শিবিরের ক্ষুধার্ত এবং পিপাসার্ত মুসলমানদের ১৭২ জনকে লৌহ খনিতে নিক্ষেপ করে এবং হত্যা করে। ঐ শিবিরের আরও ৩৩ জনকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

□ অবরুদ্ধ সেরেব্রোনিকা। দুই হাজার আহত ও পীড়িত মানুষের এক ক্যাম্পের করুণ পরিণতি সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডঃ সিসোন মরুভেলকে এক রেডিও সাক্ষাতকারে বলেন, এইসব অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশুদের কোন খাদ্য ও পানি সরবরাহ করেনি সার্ব সেনারা। ফলে ক্ষুধার তীব্র কষাঘাতে প্রতিদিনই ৩০/৪০ জন মুসলমানকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। আর মজা করে এইদৃশ্য দেখেছে সার্ব সেনারা।

□ ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাসের ঘটনা। সারায়েভো তখন প্রচণ্ড শীত। বন্দী শিবিরগুলোতে খালি গায়ে আটকে রাখা হয় হাজার হাজার মুসলমানকে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার একজন প্রতিনিধি জানান, মাত্র ২৪ ঘন্টায় একটি শিবিরের

২০০ জন মুসলমান প্রচণ্ড শীত ও খাদ্যের অভাবে কাতরাতে কাতরাতে মৃত্যুবরণ করে।

□ মিসেস স্টানকা ভোলেদার নাম্নী এক মহিলার হৃদয় স্পর্শী বিবরণ হতে জানা যায়, তিনি ৪টি শিশুর খাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্য রাস্তায় বেড়িয়ে পড়েন। জাতিসংঘ সদর দপ্তর পর্যন্ত ৫ মাইল হেঁটে বহু খুঁজেও কোন খাদ্যের যোগাড় মেলেনি। আবর্জনার স্তুপগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজেন তিনি। অবশেষে তিনটি পচা আলু এবং একটি পেয়াজ খুঁজে পান। বাড়িতে এসে এগুলো রান্না করে শিশুদের খাওয়ান এবং কোন রকমে জীবন বাঁচান শিশুদের। তবে পরে এইসব শিশু সার্বদের হত্যাযজ্ঞ হতে রেহাই পেয়েছিল কিনা জানা যায়নি।

□ বেলগ্রেডে অবস্থিত তানয়ুগ বার্তা সংস্থার এক খবরে প্রকাশ, সার্ব সেনারা সারায়েভোর একটি এতিম খানায় ইচ্ছাকৃতভাবে গোলাবর্ষণ করে। এতিমখানায় সবাই ছিল শিশু। সার্বদের গোলার আঘাতে ১৩ জন অসহায় শিশুর মৃত্যু হয়। আহত হয় কয়েক শত।

□ সাবেক যুগোস্লাভিয়ার মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতা জনাব জকুব সেলিম। তিনি ক্রোসীয় দৈনিক ভেসানজিকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে বোসনিয় মুসলমানদের দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে জানান, সার্ব নেতারা মসজিদগুলোর ইমামদের প্রতিনিয়ত হত্যা করেছে। মুসলিম মহিলাদের ধর্ষণ করেছে এবং শিশু ও বৃদ্ধরাও অবলীলাক্রমে সার্বিয়ান সেনাদের রক্ত লোলুপতার হাতে জীবন দিচ্ছে। সে এক অভাবনীয় বর্বরতা যা বোসনিয়ার আকাশকে বেদনায় ভারাক্রান্ত করে রেখেছে।

□ বোসনিয়া-হার্জেগোভিনার দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রাচীন নগরী মোস্তার। নগরটি ক্রোয়াট বাহিনীর বর্বরতায় বিবর্ণ, ধ্বংসপ্রাপ্ত। এক খবরে প্রকাশ ক্রোট খৃষ্টান সেনারা নগরীতে ঢুকে ঘরে ঘরে হত্যাকাণ্ড চালায়। ঘরবাড়ি পুড়ে দেয় এবং সম্পদের ব্যাপক ধ্বংস করে।

□ বোসনিয়ার ব্রাকো শহর। একদিন গভীর রাতে সার্ব সেনারা গোটা শহরের চারিদিকে অবস্থান নেয়। তারপর অবিরাম গুলি বর্ষণ করতে থাকে শহরের জনগণের উপর। প্রায় ভর দুপুর কয়েক শত মুসলমান জাতিসংঘ প্রোটেকশান ফোর্সের মুখপাত্র ক্যাপ্টেন বিল কারাকটিন জানান, সার্ব বাহিনীর এই গুলি বর্ষণ ছিল তাদের মনগড়া ও অপ্রয়োজনীয় তামাসা যা বহুলোকের জীবন এবং সম্পদকে তছনছ করে দেয়।

□ হারজেগোভিনার রাজধানী শহর। ৯৩ সালের ৯ই মে ক্রোয়াট বাহিনীর সদস্যরা তা আক্রমণ করে এবং বেপরোয়াভাবে মুসলমানদের উপর হামলা চালিয়ে গোটা এলাকায় ভয়াবহ আতঙ্কের সৃষ্টি করে। জাতিসংঘ বাহিনীর কমান্ডার ফিলিপ মরিলন বলেন, ক্রোয়াটরা মুসলিম গ্রামগুলোতে গণহত্যা এবং গণধর্ষণ চালায় এবং বিষয় সম্পদ সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বোসনিয়ায় সার্বিয় আক্রমণের গোড়ার দিকে ক্রোয়াটরা মুসলমানদের বন্ধু থাকলেও বর্তমানে তারাও সার্ব জঙ্গী সেনাদের মতই মুসলমান হত্যায় মত্ত রয়েছে।

□ আরেক দিনের ঘটনা। ক্রোশীয় সৈন্যরা বোসনিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের প্রাচীন নগরী মোস্তারে আক্রমণ চালায়। মুসলিম সেনা বাহিনী প্রধান সাকার হালিলোভিক বলেন, ক্রোয়াটদের অতর্কিত হামলায় মোস্তার নগরী একটি ধ্বংসস্থাপে পরিণত হয়। ক্রোয়াটরা নৃশংস পন্থায় জাতিগত নির্মূল অভিযান চালায়। ফলে মোস্তারের রাস্তায় রাস্তায় অসংখ্য মানুষের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে। জাতিসংঘ বাহিনী প্রধান মরিলন জানান, ঐ দিন ক্রোয়াটরা মোস্তারে চার হাজার গোলা বর্ষণ করে।

□ বর্বর সার্ব বাহিনীর সদস্যদের মানসিকতা পশুর চেয়েও অধম। ওরা মুসলমানদের হত্যা এবং নির্যাতন করেই শুধু ক্ষান্ত হয়নি। বোসনিয়া এবং হার্জেগোভিনার শহরগুলোর মানুষ যাতে স্বাভাবিক জীবনের কথা চিন্তাই করতে না পারে তার জন্য সার্বরা শহরের পানি সরবরাহ লাইন এবং বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেয়। ফলে পানির অভাবে হাজার হাজার মুসলমান মৃত্যুবরণ করে। শুধু তাই নয়। আহতদের চিকিৎসার জন্য ঔষধপত্র যাতে শহরগুলোতে পৌঁছতে না পারে তার জন্য সকল ধরনের ত্রাণ এবং সাহায্য তৎপরতাকে প্রতিহত করে সার্বিয়ান সেনারা। গোটা এলাকার সবগুলো মুসলমানকে না খেয়ে মেরে ফেলার জন্যই সার্বদের এই তাণ্ডবলীলা।

□ বোসনিয়ার অদূরে এক বন্দী শিবির। কয়েক হাজার মুসলিম নারী পুরুষ ও শিশুকে নর্দমাস্ত্র এই শিবিরে আটকে রাখা হয়। শিবিরটির উপরে খোলা আকাশ। চারপাশে লোহার পাত দিয়ে ঘেরা। এই রৌদ্র বৃষ্টিতে এই সব মুসলমানদের যে করুণ দশার সৃষ্টি হয়েছিল তা ভাষা দিয়ে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। মন দিয়ে শুধু অনুভব করা যেতে পারে, যার মর্মান্তিকতা সকলের গা শিউরে দেয়। তাছাড়া শীতের প্রচণ্ড কীপন, ক্ষুধার তীব্র জ্বালা এবং পিপাসার যার পর নাই কষ্ট এই বন্দী শিবিরে এক কিয়ামতের তাণ্ডব লীলার সৃষ্টি করে।

□ বোসনিয়া-হার্জেগোভিনার বিভিন্ন স্থানে সার্বরা মুসলমানদের হত্যার

সাথে সাথে মসজিদ, মস্কব এবং স্কুল কলেজও ধ্বংস করে। ইসলামের শেষ আলোটুকুর অস্তিত্ব যেন না থাকে তার জন্য খৃষ্টান সার্ব সৈন্যরা সে দেশের মসজিদ মস্কব এবং স্কুলগুলোর একের পর এক ধ্বংস করে। ফলে অসংখ্য মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

□ বোসনিয়ার এক অধ্যাপিকা আদিলা ক্রোসো সম্প্রতি তেহরানে এক সম্মেলনে বোসনিয়ার নারীদের করুণ চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বোসনিয়ার নারীরা আজ চরম বঞ্চনার শিকার। তারা সার্ব ক্রোটদের সামগ্রীতে পরিণত। এই সব পাষাণ্ড পশুরা মুসলমান নারীদের উপর যে কি বীভৎস নির্যাতন চালাচ্ছে তা কল্পনা করতেও গা শিউরে উঠে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বর্বরতার সাথেও তার তুলনা করা যায় না বলে ক্রোসো মন্তব্য করেন।

□ ১৯৯২ সালের ১৭ই আগস্ট নিউজ উইক পত্রিকার এক তথ্য বিবরণী এই রকম : একটি বন্দী শিবির হতে ১০০ জন মুসলিম বন্দীকে অন্য এক বন্দী শিবিরে স্থানান্তর করে সার্ব সেনারা। পশ্চিমধ্যে ৩০ জন মুসলমানকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ক্ষুধার্ত বালকদের দেয়া হয় জীবানুনাশক মেশানো পাউরুটি। পাউরুটি মুখে দেয়ার সাথে সাথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ওরা।

□ একটি বন্দী শিবির। শ'তিনেক বন্দী মুসলমান। বেশ ক'দিন নাওয়া খাওয়া নেই। ক্ষুধার জ্বালায় কাতরাচ্ছে অনেক ছোট শিশু এবং মহিলা। এমন সময় কয়েকটি এলসেশিয়ান কুকুরকে বন্দীদের উপর ছেড়ে দেয় সার্ব সেনারা। বহু বন্দীর দেহকে ছিন্ন ছিন্ন করে দেয় ক্ষুধার্ত এবং হিংস্র কুকুরগুলো।

□ ২রা আগস্ট '৯৩। মোস্তারের উপর ব্যাপক গোলা বর্ষণ করে সার্ব সেনারা। দু'দিন যাবত ক্রমাগত গোলা বর্ষণে প্রায় দেড় হাজার মুসলমান বন্দী হয়ে পড়ে। কামানের গোলায় ১০টি গ্রাম সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। নিহত হয় ২০০ মুসলমান। আহত হয় কয়েক সহস্রাধিক মানুষ। রক্তে ভেসে যায় গোটা এলাকা।

অবরুদ্ধ বিহাচ

দীর্ঘ ৩১ মাসের অসম যুদ্ধের পর সম্প্রতি মুসলমানরা বেশকটি অসাধারণ বিজয় লাভে সমর্থ হয়। মুসলমানরা বিহাচের ২০০ কিলোমিটার এলাকা দখল করে নেয়। একে একে বুগজনো, গর্নজি, ভাকুপ, দনজি এবং সিপোভো মুসলিম বাহিনীর পদানত হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও কৌশলগত এলাকা কুপ্রেসও মুসলিম বাহিনীর দখলে চলে আসে। বসনীয় সরকারী বাহিনী বিগত ৩রা নভেম্বর এ শহরটি দখল করে নেয়। সারায়েভোর একশ কিলোমিটার পশ্চিমে মধ্য বসনিয়ার কৌশলগত দিক হতে গুরুত্বপূর্ণ কুপ্রেস দখলের সময় সার্বদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। জাতিসংঘের আরোপিত অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার পর পর্যুদস্থ বোসনিয় মুসলমানদের এই বিশ্বয়কর বিজয় সার্বিদের আতঙ্কিত করে তুলে। এতে ইউরোপ ও আমেরিকার ইসলাম বিদ্বেষী লোকদের মাথাকেও ঘুরিয়ে দেয়। তাই অনেকেই আশংকা করছিলেন যে, বোসনিয়া শীঘ্রই হয়ত সার্বদের পক্ষ হতে একটা প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে। সম্প্রতি বিহাচে সার্বদের আক্রমণ এবং হত্যাযজ্ঞ এই আশংকা সত্য বলে প্রমাণ করেছে।

বিহাচ হলো জাতিসংঘ ঘোষিত ৫টি তথাকথিত নিরাপদ অঞ্চলের একটি। কিন্তু এই এলাকার ৭০ হাজার মুসলমানকে রক্ষার জন্য জাতিসংঘ কোন কার্যকর ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে পারেনি। গত ৩১ মাসব্যাপী সার্বদের বর্বরোচিত হামলা এবং সবশেষে জাতিসংঘ ঘোষিত কথিত 'নিরাপদ অঞ্চল' সার্ব বাহিনী কর্তৃক দখল জাতিসংঘের প্রতি তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের আস্থাকে হতাশ করেছে। পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম থেকেই জানা যাচ্ছে যে, যে মুহূর্তে সার্বরা বিহাচ আক্রমণ করছে, গণহত্যা ও লুটতরাজ করছে তখন ন্যাটোর বিমানগুলো সার্ব আগ্রাসীদের লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত না করে শুধুমাত্র আকাশ দিয়ে উড়ে গেছে। শুধুমাত্র বোমা ফেলা হয়েছে রানওয়ের ওপর। টাইম সাময়িকীর ভাষ্য অনুযায়ী ন্যাটোর বোমারু বিমানগুলো ইটালী বিমান ঘাঁটি থেকে উড়েছে ঠিকই। কিন্তু তারা সার্ব বিমান এবং সৈন্যদের ওপর কোনো প্রতিরোধ হামলা করেনি। তারা শুধুমাত্র সার্বিয়ার বিমান বিধ্বংসী দুটি স্থাপনার ওপর আঘাত হেনেছে স্বল্প মাত্রায়। আগ্রাসী সার্ব বাহিনীর হাতে বিহাচের পতনের পর যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া,

জার্মানী ও বৃটেন নিয়ে গঠিত সংযোগ গ্রুপ যুদ্ধ বিরতির আহবান জানানো সত্ত্বেও সার্বরা এতে কোনো সাড়া দেয়নি। মার্কিন সিনেটের সিনিয়র রিপাবলিকানরা বলেছেন বসনিয়ায় যুদ্ধ বন্ধ করতে জাতিসংঘ এবং উত্তর আটলান্টিক জোট ন্যাটোর চরম ব্যর্থতা এই উভয় সংগঠনকেই বিতর্কিত করেছে। ইউরোপে ন্যাটোর কার্যকর প্রেক্ষিত নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠেছে। প্রভাবশালী রিপাবলিকান সদস্য রবার্ট ডোল বলেনঃ ন্যাটো পুরোপুরি অকেজো হয়ে পড়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের উচিত ব্যর্থতার জন্য জাতিসংঘকে আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেয়া। ন্যাটো ও জাতিসংঘ বসনিয়ায় যা করেছে তা হলো সার্বদের সাহায্য করা। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক বলেছেন যে ন্যাটো বসনিয়ায় সার্ব আক্রমণ ঠেকাতে পারবে না। এছাড়া বসনিয়া প্রশ্নে ইউরোপীয় মিত্র দেশগুলোর মধ্যে বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে। তাদের কেউ কেউ বলছেন যে বসনিয়ায় মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে। সার্বরা বসনিয়ার ৭০ ভাগ এলাকা দখল করে নিয়েছে। এছাড়া এ বিষয়েও একমত হয়েছেন যে জাতিসংঘ ও এর নিরাপত্তা পরিষদ বিশ্ব জনমতকে এর হাতের পুতুলে পরিণত করেছে। শেষ কথা বসনিয়ায় জাতিসংঘ ও ন্যাটো উভয়ই নীরব ভূমিকা পালন করে বিশ্ব মানবতা ও সভ্যতার ইতিহাসকেই কলংকিত করেছে। বিহাচ যুদ্ধের সময় জাতিসংঘ মহাসচিব বুটোস ঘালী সার্ব নেতা রাদোভান কারাজদিক—এর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সার্ব নেতা সরাসরি বলে দিয়েছেন যে তিনি মহাসচিবের সঙ্গে দেখা করবেন না। এ খবরও রীতিমত বিশ্বয়ের ও শংকার। কারণ যে জাতিসংঘ বর্তমান বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার কথা বলছে সেখানে সার্বদের কাছে এর গুরুত্বহীনতা আতঙ্কেরও বটে।

অবশ্য সার্বরা এই শক্তি ইউরোপ থেকেই পেয়েছে। ইউরোপীয় কিছু দেশই জাতিসংঘকে বসনিয়া ইস্যুতে অকার্যকর করে তুলেছে। বিশেষ করে ফ্রান্স এবং বৃটেনই সার্বদের আগ্রাসী তৎপরতাকে সমর্থন করেছে এবং সহযোগিতা করেছে তাদেরই।

সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টো তার বৃটেন সফরে বসনিয়ার মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র সরবরাহের যে প্রস্তাব দিয়েছেন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ মেজর তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। জাতিসংঘ বাহিনীতে অংশগ্রহণকারী প্রধান দুটি দেশ বৃটেন ও ফ্রান্স ন্যাটোর হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি ও বসনিয়ার ওপর থেকে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিরোধিতা করে আসছে। কেন

তাদের এই বিরোধিতা? এর পেছনের কারণই বা কি হতে পারে? বৃটেন কি আসলেই একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ? এই প্রশ্নই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে দিনে দিনে। পর্যবেক্ষকেরা বলছেন যে বৃটেন এবং ফ্রান্সসহ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ জাতি ও ধর্মগত বিদ্বেষে ভুগছে। তারা চায় না যে কোনভাবেই বসনিয়ায় একটি মুসলিম রাষ্ট্র গড়ে উঠুক। এরা মুখে আধুনিকতা, মানবতা ও অসাম্প্রদায়িকতার কথা বললেও তারা খৃষ্টান ধর্মের অনুসরণের ভিত্তিতেই বর্তমান সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করছে। তারা ক্রুসেডের যুদ্ধের স্মৃতি ভুলে যায়নি। আর এ কারণেই তারা বিপন্ন মানবতার আর্তনাদে সাড়া না দিয়ে নিরপরাধ মানুষের রক্তপিচ্ছিল পথকেই অনুসরণ করছে। জাতি ও ধর্মীয় গোঁড়ামির শৃংখল থেকে ইউরোপীয়রা যে এখনো বেরিয়ে আসতে পারেনি তা এখন দিনের আলোর মতোই সত্য। আবার যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাও এখানে বিতর্কিত। দীর্ঘদিনের যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় মিত্ররা যেখানে সার্বদের সহযোগিতা করছে সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা অস্পষ্ট। মার্কিন প্রশাসন সার্বদের ভূমিকা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও তারা বাস্তব ক্ষেত্রে তেমন কোনো ভূমিকা এ পর্যন্ত নেয়নি।

সম্প্রতি সার্বদের হাতে বিহাচ পতনের পর যুক্তরাষ্ট্র তার পূর্ব অবস্থান থেকে আরো সরে এসেছে এবং সার্বদের সঙ্গে দৃশ্যত একটি আপোসেরই প্রস্তাব দিয়েছে। বসনিয় সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এ প্রসঙ্গে মার্কিন প্রস্তাব হলো বেলগ্রেড বসনিয়া-হারজেগোভিনাকে স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত সার্বিয়ার সঙ্গে বসনিয় সার্বদের কনফেডারেশন গঠন প্রস্তাবকে সমর্থন করবে না। সার্বদের সমর্থক রাশিয়াও বসনিয়ার নতুন শান্তি পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে কনফেডারেশনের ধারণাটি পাঁচ জাতির কন্ট্রাষ্ট গ্রুপে সুপারিশ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক এই প্রস্তাব তাই রাশিয়ার অবস্থানকেই সংহত করলো। এ কারণেই যুগোস্লাভিয়া থেকে সার্ব বাহিনীকে জ্বালানি সরবরাহ বন্ধের লক্ষ্যে নিরাপত্তা পরিষদে আনীত প্রস্তাবে রাশিয়া এ সপ্তাহে ভেটো প্রয়োগ করেছে। পশ্চিমা দেশসমূহ ও বৃহৎশক্তির মধ্যে বসনিয়া প্রশ্নে দ্বৈত অবস্থান বসনিয়ার যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করেছে। পর্যবেক্ষকেরা বলছেন বসনিয়ার নিরপরাধ মানুষকে সার্বদের হাতে বরং নানা কৌশলে পশ্চিমারা তুলে দিয়েছে। যার অর্থ হলো বসনিয়ার মুসলমানদের সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলো থেকে আলাদা মনে হলেও এটি যুক্তরাষ্ট্রের নিতান্তই কৌশল মাত্র। ধর্মীয় ও জাতিগত উন্মাদনাতেই আসলে এইসব দেশ বসনিয়ার মুসলমানদের ব্যাপারে উদাসীনতার নীতি অবলম্বন করেছে।

বোসনিয়ার আত্ননাদ

